KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. : KLMLGK 200	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLG	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২৫/- ২৫/- ২৫/-	Year of Publication : শ্রাবণ ১৩৮৪ ।। Aug 1977 অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ ।। Dec 1977 পৌষ ১৩৮৪ ।। Jan 1978
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

পঞ্চবিংশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এক জাতি এক প্রাণ একতা

এঁরা মিলেমিশে
এক হয়ে গিয়েছেন

শিল্পের বিকাশে...

রমনলাল মহেতা প্রায় বিশ বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে একটি ছোট বোতামের কারখানা খুলেছিলেন . . . সেই কারখানা আজ এতো বড় হয়েছে . . . আরও অনেক স্ত্রী পুরুষ কাজ পেয়েছেন।

আর তা সম্ভব হয়েছে সকলে মিলেমিশে কাজ করেন বলে। রমনলাল হলেন গুজরাতের লোক কিন্তু তিনি কান্নাড় ভাষা শিখেছেন। তাঁর ম্যানেজার, ফোরম্যান, সুপারভাইজার কিংবা কর্মচারীরা এসেছেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে . . . তাঁদের ভাষা আলাদা, পোষাক আশাক আলাদা, খাওয়াদাওয়া আলাদা আর রীতিনীতিও আলাদা কিন্তু কারখানায় তাঁরা একটি ভাষাতেই কথা বলেন আর তা হল কাজের ভাষা। শিল্পের বিকাশে অন্তরায় কোথায়?

লেস মনই বাধার প্রাচীর> আমরা তা ভাঙতে পারি

davp 77/50 Ben.

পঞ্চবিংশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা   স   শ্রাবণ তেরশ' চুরাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

পাতাল যেথায় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ১৪১

মুদ্রাপৃষ্ঠে ইতিহাসের লিখন ॥ মুহম্মদ আয়ুব হোসেন ১৪৫

গাত্র রঙ্গোলি ॥ মঞ্জুলা সরকার ১৪৯

বিস্মৃত আর এক পদকর্তা—সতীশচন্দ্র ॥ সুভাষ পাঠক ১৫৬

শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা ॥ গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১৬৫

আলোচনা: রহস্যের কবি এডগার এ্যালান পো ॥ সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ১৬৭

সমালোচনা: বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তর কাল, বঙ্কিম উপন্যাসের উপাদান বিচার, বঙ্কিম অভিধান ॥ প্রণবকান্তি সিংহ ১৭০

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

কলকাতা কালে কালে

কলকাতা একদিনে হয়নি। কালে কালে বদলেছে। মহানগরী হয়ে ওঠার পথে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক দুর্বিপাক। ১৭০০ সালের কথাই ধরা যাক। সেদিনের কলকাতায় না ছিল কলের জল, না গ্যাসের বাতি, না পাকা বাড়ি, না রাজপথ। যানবাহন বলতে একটিই। পাল্কি। বিদ্যুতের আলো কিংবা কলে-চলা গাড়ি কলকাতাবাসীর কাছে ছিল স্বপ্নেরও অতীত।

আজকের কলকাতায় ভূগর্ভ-রেল কিন্তু আর স্বপ্ন নয়। একটি বাস্তব পরিকল্পনা। কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত আয়তন, অপরিসর পথ এবং যানবাহনের সংখ্যাল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ-রেলের প্রয়োজনীয়তা আজ একান্তভাবেই জরুরী। কিন্তু এই বিশাল পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার পথে সবার আগে প্রয়োজন কলকাতার মানুষের সহৃদয় সহযোগিতা।

কলকাতা একদিনে হয়নি

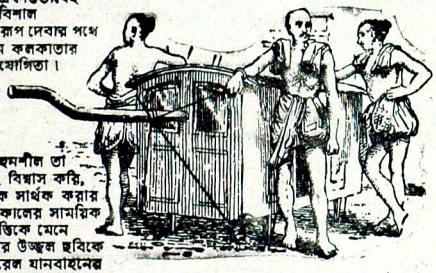

কলকাতার মানুষ সহনশীল তা আমরা জানি। এবং বিশ্বাস করি, এই বিপুল কর্মযজ্ঞকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় তাঁরা কিছুকালের সাময়িক দুর্ভোগ ও বাধা-বিপত্তিকে মেনে নেবেন আগামীকালের উজ্জ্বল ছবিকে মনে রেখে। ভূগর্ভ-রেল যানবাহনের তালিকায় শুধু একটা নতুন নাম নয়, কলকাতার নতুন মানচিত্র গড়ে তোলার এক সুবৃহৎ উদ্যোগ।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

MTP

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

শ্রাবণ
তেরশ' চুরাশী

সমকালীন

৪র্থ সংখ্যা
পঞ্চবিংশতি বর্ষ

পাতাল যেথায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

মহাকাশের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াতের যান বাহন এবং তার যাত্রিদের পোষাক পরিচ্ছদের একটা হদিশ মেলে কিছু কিছু বৈদিক সূক্তের ইঙ্গিতে এবং মহাভারত ও সুপ্রাচীন পুরাণগুলির কথা কাহিনীর মাধ্যমে, কিন্তু এই পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আরও তলদেশ, তারও ভিতরে আরও নিকেতন, তাকেও অতিক্রম করে আরও নগরী নিবাস আছে, তারপর, তারপর করে ক্রমে সাতটি ভূস্তরে যাওয়া চলে, অথবা ঐ সব স্তরলোক থেকে আবার ফিরে এসে, এমনি উপরের দিকেও স্বঃ, মহ, জন, তপ, সত্য লোকে যাওয়া আসা করা যায় এসব বক্তব্য রাখতে গেলেই রূপক উপাখ্যান শোনায়, কিন্তু ভূ আর ভুব যে উর্দ্ধাধঃ লোকের যোজনার যোজক হয়ে আছে, এবং শতপথ ব্রাহ্মণের ৭।১।২।২৩ সূক্তে যে 'অন্তরা বা ইদং ঈক্ষং অভূদ্ ইতি তস্মা দন্তরিক্ষম্' অর্থাৎ মহাকাশ থেকে উভয় লোকই নিরীক্ষণ করা যায় এ নিদর্শন যেমন আছে, তেমনি সর্বাধিক প্রামাণ্য পুরাণগুলির অন্যতম বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের তথ্যগুলিও আমাদিগকে চকিত চিন্তার প্রেরণা যোগায়—ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে সৃষ্টির অন্তর বহিঃর্লোকের ভাবনা মনীষী করেন—

যস্যেহাবয়বৈ লোকান্ ভবয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভি রধঃসপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ॥

অর্থাৎ মনীষীগণ ভাবনা করেন, একটি পুরুষেই পদতল থেকে উপরেরদিকে মূর্ধা পর্যন্ত যেমন ভাগ করলে তার মধ্যে ১৪টি স্তর আছে তেমনি এই যে ভূলোক এরই উপরে আছে ভুবর্লোক। ভূলোক ও ভুবর্লোকের মধ্যবর্তী স্থানই আকাশ, ভুবর্লোকে আছে আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোক। যে গুলিকে আমরা গ্রহান্তর বলি আবার ভূলোকেও আছে কত দ্বীপ কত পর্বত।

মাঝে থাকে অবকাশ বা আকাশ। তারপর ভূলোকের অধোভাগেও আকাশ তারপর অতল, বিতল, সুতল, (কোথাও নিতল সংজ্ঞা) গভস্তিতল, মহাতল, সুতল এবং শেষ তলের নাম পাতাল।

এভাবে ভূলোকের অধোভাগে যে এক একটা স্তর আছে এবং যে সব স্তরেও বহু রমণীয় লোকাবাস আছে সে সংবাদ বিস্তৃত করে বর্ণনা করা আছে বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অঙ্কের ৫ম অধ্যায়ে—

কিছুটা নমুনা—এ অংশের বক্তা মুনি পরাশর, শ্রোতা মৈত্রেয়—'এর আগে পৃথিবীর বিস্তার কতখানি তা বলা হয়েছে, এবার পাতালের যে সাতটা পংক্তি আছে, তা হচ্ছে—'সপ্ততিস্তসহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োপি কথ্যতে—। এখানের উচ্ছ্রিত একটি সংজ্ঞা লক্ষ্য করার মত। এই উদ্ধৃত শব্দটির অর্থ পাণিনি ব্যাকরণের ৪।৩।৪৯ (সিদ্ধান্ত-কৌমুদি) সূত্রে উচ্ছ্রয় ও উচ্ছ্রিয় শব্দের অর্থ উদ্গত, উত্থিত। যেমন উচ্ছ্রিত ধ্বজ (রামায়ণ ২।৪৩।১০) রঘুবংশ (৯।১৯) উচ্ছ্রতম্ ছত্রম (রঘুবংশ ১৭।৩৩) অর্থাৎ সর্বশেষ পাতাল থেকে উপরের দিকে সাতটি—তল আছে। অতএব শেষ পাতাল, তার উপরে সুতল, এমনি উপরদিকে উঠে এসেছে এক একটা তল এবং উপরের শেষ তলটির নাম অতল। অতলের উপরেই আমাদের ভূতল।

অতলং বিতলংচৈব নিতলংচ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥

প্রতি তলেই ভূমি আছে, প্রতি তলেই উৎকৃষ্ট প্রাসাদ এবং সে সব তলের প্রাসাদে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের সংজ্ঞা দানব, দৈত্য, যথা ইত্যাদি। সকলের মধ্যেই পুরুষ রমণী আছে।

'দৈত্য-দানব-কন্যাভি-রিত শ্চেতশ্চ শোভিতে'

এই শ্লোকগুলির দ্বারা অকস্মাৎ বোঝা যায় না, এক এক তলের আয়তন কত? এবং সত্যই সে লোকগুলি কারোর দেখা কি না।

বিষ্ণু পুরাণের ঐখানেই বলা হয়েছে, হ্যাঁ নারদ যাতায়াত করতেন, এবং তিনিই এক সময় পাতাল থেকে ফিরে এসে স্বর্গে গিয়ে (অর্থাৎ ভুর্বলোকের ঠিক উপরের লোকের নাম স্বর্গ) স্বর্গ বাসিদের শোনালেন আরে পরপর যত তল এবং পাতালের মত সুন্দর রমণীয় লোক আছে তেমন লোক স্বর্গও নয়, আবার গভস্তি লোক যেটি সেও অতীব সুন্দর—

স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালেনীতি নারদঃ।
প্রাহ স্বর্গসদাংমধ্যে পাতালেভ্যো গতো দিবি।

ও সব তলের ভূমির রং— শুক্লা শুক্লা কৃষ্ণা পীতা শর্করা শৈল কাঞ্চনা।
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বর প্রসাদ মণ্ডিতাঃ॥

এই পর্যন্ত এসে খট্‌কা লাগে এই সব লোকের যে পর পর অবস্থান তা তাদের মধ্যে ব্যবধান ও পরিমাপটা কত? মূল শ্লোকে বলা হয়েছে—দশ সাহস্রং এবৈককং পাতালং মুনিসত্তম।

এ অংশের সরল অর্থ 'দশ হাজার' যোজন এক একটা লোকের পরিমাণ। এ অর্থে যে খুবই অস্পষ্টতা আছে, তা বুঝেই প্রবীণ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

'দশসাহস্র মিতি প্রত্যেকং সহস্র যোজনোচ্ছ্রিতা ভূমিকাঃ।
ততো নব সহস্রোচ্ছ্রিতমেকৈকং পাতালং ভূবিবরম্।

সহস্র যোজনানি অন্যেষাং জলানি অন্তঃ অনেময়ঃ।
প্রত্যেকশঃ অন্তঃ অন্যেষাং সহস্রাণি নব অধ্বনাম্।

অর্থাৎ দশ সাহস্রং এই কথাটির অর্থ—ভূবিবরগুলির পরপর তলগুলির হাজার যোজনব্যেপে জলের ব্যবধানে আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক তলের ব্যবধান অপরের থেকে এক হাজার যোজন, এবং সেটা জলময়। আরও স্পষ্ট হলো একহাজার যোজন জলপথ পার হলেই নহাজার যোজন ব্যেপে ভূখণ্ডই এক একটি তলের সংজ্ঞা। উপরে ও নীচের আয়তন ৯ ন হাজার যোজন বিস্তৃত।

এখন প্রশ্ন পৌরাণিকদের `যোজন শব্দটি' কত মাইল কে বা ক্রোশকে বোঝান হয়?

যোজন শব্দটি ঋকবেদের ২।১৬।৩ সূক্তে আছে। পাণিনির ৫।১।৭৪ সূত্রে তার অর্থ করা হয়েছে ক্রোশ চতুষ্টয়ঃ। অর্থাৎ চারক্রোশের নাম যোজন। (এই বৈদিক শব্দগুলি কোথায় কোন্ গ্রন্থে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা 'বাচস্পতি' নামে সুদীর্ঘ নিবন্ধ 'দেশ' পত্রিকায় যে ১৯৭৭ থেকে বের করছি)।

অতএব বৈদিক 'যোজনের' পরিমাণ যখন ব্যাকরণ ও পুরাণের সমর্থিত চার ক্রোশ, তখন বোঝা গেল প্রতিটি তল অপর তল থেকে এক হাজার যোজন ব্যাপী জল পার হলে, পাওয়া যাবে, এবং প্রতিটি তলের আয়তন নয় হাজার যোজন বিস্তৃত।

এবার প্রশ্ন সেই সব তলে, কি সূর্য চন্দ্রের আলো যায়? আর বায়ু?—

এর উত্তরে বলেছেন সর্বমেব 'গভস্থিমৎ' অর্থাৎ প্রতিটি তলেই গভস্তি যুক্ত। এবং ঐ গভস্তি সংজ্ঞাতেও আছে চতুর্থ স্তল। আবার প্রশ্ন গভস্তি মানে কি?—(এ প্রশ্ন শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত মহাশয় তুলেছেন পাতাল কোথায়? শীর্ষক নিবন্ধে, যেটি গত বৈশাখ সংখ্যায় সমকালীনে মুদ্রিত হয়েছে, এবং যেটির গভীর তত্ত্বও তথ্য জিজ্ঞাসা রয়েছে বিশ্বখ্যাত ডঃ দানিকেনের বীজ ও মহাবিশ্ব গ্রন্থে)।

'গভস্তি' শব্দটি বৈদিক। ঋকবেদের ১।৫৪।৪ সূক্তের গভস্তি নামটিকে সায়ণ বলেছেন বর্ণ-বিপর্যয়ের অথবা বর্ণাগমে এটি গভুস্তি ই; গভস্তি নাম পূর্বে বা পরেই এসেছে। হস্তগৃহীত। এর মৌল অর্থ সরলার্থ 'কিরণ'।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যের ৩।৩৭ শ্লোকে গভস্তি শব্দটিকে সূর্য বলেছেন। আর বিষ্ণুপুরাণে) এই ২য় অংশের ৫ম অধ্যায়ে) গভস্তি শব্দটির অর্থ—

'দিবার্ক রশ্ময়ো যত্র প্রভাং তন্বস্তি নাতপম্।
শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি দ্যোতায় কেবলম্॥

অর্থাৎ ভূলোকের প্রতিটি তলেই বিশেষ করে গভস্তি তলে (কারণ ওই নামটি গভস্তি অর্থাৎ কিরণ থেকেই) দিনের সূর্যকিরণ আছে কিন্তু তাপ নেই তার, আবার রাত্রির চন্দ্রকিরণ আছে কিন্তু শৈত্য নাই।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই ভূলোকের অধস্তলের প্রতিটি তলে প্রকৃতি একি রহস্য আমাদিগকে লুকিয়ে লুকিয়ে অফুরন্ত দান করে চলেছে? এই বিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিবিজ্ঞানীগণ কবে তা উন্মোচিত করতে পারবেন?

এই সপ্ততল পাতালের মতই ভূলোকের উর্ধ্বেও যে, লক্ষ যোজন দূরে এবং লক্ষাধিক ও কোটি যোজন এক একটি এমনি লোক আছে সে সংবাদও পুরাণ গ্রন্থে পাই, এসব লোকই যে গ্রহান্তর, তা বর্তমান মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ কিছুটা ঈশারা দিচ্ছেন, তা তো আমাদের বর্তমান ব্যবহার বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, কিন্তু ভূলোকের অধস্তলের মধ্যেও যে লোকসংস্থান রয়েছে, তা পুরাণের বার্তায় পড়া যায় মাত্র, সত্যিকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ডঃ দানিকেনের বীজ ও মহাবিশ্ব গ্রন্থের 'সুবর্ণ' প্রভৃতি নিবন্ধের মাধ্যমে পৌরাণিক সংবাদ যে অবস্তক কিছু নয়, এটায় আস্থা থাকে।

আমাদের পুরাণে ওর হয়তো তেমন সন্দেহের প্রশ্ন এসেছিল যে এত তল, পাতাল ও উর্ধলোক আছে কি ভাবে? তাতেই তারা উত্তর দিয়েছেন—

এই যে সপ্ত পাতালের কথা বললাম, এসব কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সেই বিরাটের একটা সংজ্ঞা নাম ব্রহ্ম। তাকেই মনে করা হয় দুটো যেন (অর্ধেক অর্ধেক) কটাহ অর্থাৎ কড়াই, এমনি দুটো কড়াই একত্র জুড়ে দিলে, যে রূপ বা আকৃতি হয় তখন মনে হবে এটা ডিম্ব। উর্ধে ও একটু বেঁকিয়ে নীচেও জুড়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছে (ভাবা যায় কি দুটো কড়ার জুড়ে দেওয়ার মধ্যাংশটা বেশ সুড়ঙ্গের মত এ এফোঁড় ওফোঁড় ফাঁকা ?) "এতদণ্ড কটাহেন তির্যক্ চোর্ধম ধস্তথা'। এর পরই বিষ্ণুপুরাণকার উপমা দিয়ে বলেছেন—'কপিলস্ত যথা বীজং সর্বতো বৈ সমাবৃতম্।'

বিষ্ণুপুরাণ/২য় অংশ। ৫-সপ্তম।

অর্থাৎ ঠিক যেন কয়েৎ বেলের গর্ভে বীজগুলোর অবস্থান।

কয়েৎ বেলের শাঁস, তারই আশেপাশে উপরে নীচে থাকে বীজ। এই বিশ্বটাকে বলা হয়েছে কয়েৎ বেলের আকার আর তারই অভ্যন্তরে আছে বীজবৎ লোকগুলির অবস্থান। সংক্ষেপে যদি বলা যায় বীজও মহাবিশ্ব তাহলে বোধ হয় দানিকেনের দেওয়া পরিভাষার সঙ্গে আমাদের পুরাণ-বার্তার নামকরণের মধ্যে অতি বার্তার কিছু নাই। অথবা অতিরয়ী কথাও নয়।

দুটি কটাহের মধ্যবর্তী স্থানটিকে পুরাণকার বলেছেন এর মধ্যেই রয়েছে জল, বহ্নি, বায়ু এবং আকাশ আবার তাদিকে নিয়েই আছে মহৎ তত্ত্বময় আবরণ—

'সর্বোহম্বু পরিধানৌ ৎসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতো বহিঃ।
বহ্নিশ্চ বায়ুনা বায়ুর্মৈত্রেয় নভসাবৃত্তঃ।
ভূতাদিনা নভঃ সোঽপি মহতা পরিবেষ্টিত।

পুরাণকার মন্তব্য করেছেন, ওই মহৎ তত্ত্বই একদিন অবশিষ্ট থাকবে, উর্দ্ধাধঃ তলগুলিও থাকবে কিন্তু সব শূন্যে থাকবে, অথচ এই মহান্ থাকবে অবিনশ্বর।

শূন্যো ভবতি কল্পন্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি॥ বিষ্ণুপুরাণের ঐ স্থানেই।

জানি না শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত মহাশয়ের 'পাতাল কোথায় ?' নিবন্ধের শেষ মন্তব্যগুলির সঙ্গে পৌরাণিক পাতালবার্তার মন্তব্যে কেন এত মিল!

মুদ্রাপৃষ্ঠে ইতিহাসের লিখন

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

প্রাচীন ইতিহাস রচনার নানা উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান হল মুদ্রা। মুদ্রাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ রাজার নাম, সন, তারিখ, ধাতু, লিপি, ভাষা, চিহ্ন, নক্সাদি দ্বারা আমরা সেই যুগের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। তাই মুদ্রা একটা যুগের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। তবে মুদ্রাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ ভাষা, লিপি ও অন্যান্য নানা চিহ্নাদি সম্পর্কে আলোচনা খুব দুরূহ ব্যাপার। বিভিন্ন প্রাচীন জনপদে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে আমি কিছু প্রাচীন মুদ্রা পেয়েছিলাম। সেগুলি বারবার দেখে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনার চেষ্টা করব।

আলোচিত মুদ্রাগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানায় 'মঙ্গলকোট' গ্রামে। স্থানটির প্রাচীন নাম 'উজানি মঙ্গলকোট' এই স্থানটির উত্তর প্রান্ত দিয়ে অশান্ত অজয় বৈষ্ণব তীর্থ জয়দেব-কেন্দুবিল্বের পদবিধৌত স্বাদু নীর বুকে নিয়ে বয়ে গিয়েছে আর এক বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট কাটোয়ার দিকে ভাগীরথী সঙ্গমের উদ্দেশে। অন্যদিকে স্বল্পপরিসর কুনুর নদী এর প্রান্ত ঘেঁষে প্রবাহিত হয়ে এসে মিশেছে অজয়ের বুকে অতি নিকটে। স্থানটির প্রাচীনতার অন্যতম নিদর্শন এখানের সুবৃহৎ ঢিপি, ভগ্ন দালান এবং ঢিপিতে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটির পাত্র, যক্ষ যক্ষিণীর মূর্তি, লিপি উৎকীর্ণ সিল কাঁটি (bead) কালোকার্বণ চাউল প্রভৃতি। অনুরূপ মু্া পাওয়া গিয়াছে চন্দ্রকেতুর গড়ে, বেড়াচাপায়, হরিনারায়ণপুরে, মহানাদে, কোপাই নদীতীরবর্তী সীতাগ্রামে।

প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি আমি দান করেছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নাধিকারিক শ্রীপরেশ দাশগুপ্ত, বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্ন বিভাগের অধ্যক্ষা শ্রীমতী অমিতা রায় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত প্রভৃতিকে।

প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির অধিকাংশ চৌকো এবং গোলাকার। ধাতু হল তামা। ওজন চৌকোগুলোর সিকি ভরির একটু বেশী এবং গোলাকারগুলো এক অষ্টমাংশ ভরি পরিমাণ। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ এর নাম দিয়েছেন 'Panch Marked' বা ছাঁকমার্কা মুদ্রা। কেহ কেহ ছাঁচ ঢালাই বা Copper Cast মুদ্রা। মুদ্রাবিশেষজ্ঞদের মতে মুদ্রাগুলির প্রচলন ছিল মৌর্য প্রভাতী যুগ হতে গুপ্তযুগ পর্যন্ত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এগুলির তৎকালীন নাম ছিল 'কার্ষাপণ'। মুদ্রাগুলির পৃষ্ঠে কোন লিপি নাই। আছে নানারকম চিহ্ন। চিহ্নগুলি নিম্নরূপ :—স্বস্তিক, যজ্ঞবেদী [বর্তমান রেড ক্রস চিহ্নের অনুরূপ], বৃক্ষ, স্তূপ বা শিবপর্বত, বৃষমুণ্ড, আশাদণ্ড এবং হাতী। এখন এই চিহ্নগুলো সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

স্বস্তিক :—স্বস্তিক হল বৈদিক মঙ্গলচিহ্ন। ভারতবর্ষে আর্য আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই চিহ্ন এদেশে এসেছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে নানা শুভকাজে দেওয়ালগাত্রে সিঁদুর দিয়ে এই চিহ্ন

এককে দেওয়া হয়। এই চিহ্নকে সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্য বৈদিকদের নিকট পবিত্রতার প্রতীক। অগ্নিও তাই। সূর্যকিরণ ও অগ্নিশিখার সঙ্গে এর মিল লক্ষণীয়। সূর্য নিজের আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করে।

যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্যতম উপাদান হল অগ্নি। পৃথিবীতে অগ্নিই হল সূর্যের প্রতীক। তাই সূর্য ও অগ্নি বৈদিক দেবতা রূপে পূজিত। তাই বৈদিক আর্যদের নিকট এই চিহ্ন ছিল পবিত্র ও মঙ্গলময় চিহ্ন। শুভ ও পবিত্রতার প্রতীকরূপে এই চিহ্নটিকে মুদ্রাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানদের জাতীয় প্রতীক ছিল এই এই স্বস্তিক। আর এই জার্মানগণ নিজদিগকে আর্য বলে মনে করতেন।

যজ্ঞবেদী—এই ক্রস চিহ্নটিও একটি বৈদিক মঙ্গলচিহ্ন। এই চিহ্নটিকে যজ্ঞবেদীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আর্যজাতির ধর্মকর্মের অন্যতম অঙ্গ ছিল 'যজ্ঞ'। তাঁদের মধ্যে রাজসূয়, অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের প্রচলন ছিল। যজ্ঞবেদী নানা জ্যামিতির পর্যায়ে তৈরি হত। এক একরকম যজ্ঞের বেদী ছিল এক একরকম। এটি সম্ভবত কোন এক যজ্ঞবেদীর চিহ্ন, যে যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আর্ত পীড়িতদের সেবামূলক সম্বন্ধ।

ইউরোপে বিগত ক্রিমিয়া যুদ্ধে [১৮৫২-৫৬] যুদ্ধাহত আর্ত পীড়িতদের জন্য স্বনামধন্যা মিস ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল রেড ক্রস নামে এক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতীক চিহ্নটি এই যজ্ঞবেদীর চিহ্নের অনুরূপ। বর্তমানে আহত, পীড়িতদের সেবার্থে সারা পৃথিবীতে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রশাখা গড়ে উঠেছে। এখন আমরা ভারতীয়রা দাবী করতে পারি যে মৌর্যপ্রভাতী যুগের এই সেবামূলক চিহ্নটি খৃষ্টজন্মের অনেক পরে ইউরোপে গিয়েছে আর এর জন্য ইউরোপীয়গণ প্রাচীন ভারতবর্ষের নিকট ঋণী।

ক্রস চিহ্ন খৃষ্টান সমাজে প্রচলিত হয় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক পরে। ক্রসচিহ্নটি অনেকটা ইংরেজী টি অক্ষরের মত এবং রেড ক্রস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মৌর্য প্রাচীন যুগে মুদ্রাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ এই চিহ্নটির প্রতি এই উপমহাদেশের সুধীবৃন্দের আকর্ষণ ও আলোকপাত করতে অনুরোধ জানাই।

বৃষমুণ্ড :—এই চিহ্নটিও বৈদিক আর্যদের একটি মাঙ্গলিক চিহ্ন। চিহ্নটিকে বৃষমুণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বৈদিক আর্যগণ যেসব যজ্ঞ করতেন তার মধ্যে অন্যতম হল 'গোমেধ' যজ্ঞ। [৩] গোমেধ যজ্ঞে গরুর স্নুট ও মুণ্ড কেটে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত। প্রাচীন যুগে আর্যরা বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে গোবধ করত এবং গোমাংস ভক্ষণ করত। যজ্ঞাগ্নি আহুত বৃষমুণ্ডকে তাই আর্যগণ মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করত বলে মনে হয়।

বৃক্ষ—আদিম যুগ হতে সুরু করে এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বৃক্ষ একদিকে যেমন ফলদান করে অন্যদিকে তেমনি জলকে আকর্ষণ করে। যারজন্য হয় বারিপাত। ইহাতে দেশে কৃষি কাজ হয়। মানুষ পাই খাদ্য সম্ভার। প্রখর গ্রীষ্মে ক্লান্ত তাপিত মানুষ বৃক্ষ-ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে। তাই অতি প্রাচীন কাল হতে এদেশে বৃক্ষ পূজা চলে আসছে। সিন্ধু নদী-অববাহিকায় মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা'র ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত সীলে

বৃক্ষবন্দনার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ঋগবেদে (৫মণ্ডল, ৩-৮-২) সাংখ্যায়ন এবং অন্যান্য পুরাণাদিতে বৃক্ষ রোপণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন মুনি ঋষিদের সঙ্গে বিভিন্ন বৃক্ষের সম্পর্ক দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে বুদ্ধদেবের গভীর সম্পর্ক ছিল। এই বৃক্ষমূলে সাধনা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করে ছিলেন। তাই এই বৃক্ষটিকে বোধিবৃক্ষ বলা হয়। আলোচিত মুদ্রায় উৎকীর্ণ চৌত্থুপি বৃক্ষটিকে কেহ কেহ বোধিবৃক্ষ বলেছেন। কিন্তু বুদ্ধ পূর্ব যুগেও যে বৃক্ষ পূজার প্রচলন ছিল, সিন্ধু-অববাহিকায় প্রাপ্ত শীল মোহরে উৎকীর্ণ বৃক্ষটি তার প্রমাণ। কোন কোন গবেষক মনে করেন বৃক্ষ আটবিক রাজ্য বা অরণ্য ভূমির দেবতার প্রতীক, এবং বৃক্ষ ও মঙ্গলচণ্ডী অভিন্ন।

মহারাজ অশোকের এক তাম্রপট লিপিতে প্রায় অনুরূপ বৃক্ষের চিত্র উৎকীর্ণ আছে। এই তাম্রপট-টি-পাওয়া গিয়াছে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার সোহগৌরা গ্রামে।

মৌর্য প্রভাতী যুগের এই মুদ্রায় বৃক্ষের চিত্র উৎকীর্ণ করে মৌর্যরাজগণ বৃক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন বলেই ধারণা করা যেতে পারে।

স্তূপ/শিবপর্বত/বাস্তু স্তূপ/স্থাণীশ্বর—দুইটি বৃত্তের মধ্যপরি একটি বৃত্ত, উপরে চন্দ্রবিন্দু। এই চিহ্নটি বৌদ্ধ স্তূপ হতে পারে। বৌদ্ধ স্তূপের গঠন কতকটা অনুরূপ। শুধুমাত্র চন্দ্রবিন্দু শীর্ষচ্ছত্র বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর দেহাবশেষ ও স্মৃতিচিহ্নের উপর স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। তাই কোন কোন গবেষক এই চিহ্নটিকে বৌদ্ধস্তূপ বলে মনে করেন। চিহ্নটি চন্দ্রবিন্দুশীর্ষ-হেতু কোনকোন গবেষক এটিকে 'শিবপর্বত' বা কৈলাস বলে মনে করেন। শিবের কপালে চন্দ্র দেখা যায়। শিবের লিঙ্গ পূজা হয়। তিনি থাকেন কৈলাসে। কৈলাস পর্বতের উপর নির্মিত। কোন কোন গবেষক এটিকে বাস্তুস্তূপ বা স্থাণীশ্বর বলে মনে করেন। এদেশে নির্মিত বাসগৃহে এই শ্রেণীর পুরাতন চিহ্নবিশেষ দেখা যায়। উত্তর প্রদেশে গোরখপুর জেলায় সোহগৌরা গ্রামে তাম্রপট লিপির শীর্ষে অনুরূপ চিহ্ন দেখা যায়।

আশাদণ্ড :—এই চিহ্নটিকে আশাদণ্ড বলা যেতে পারে। বিভিন্ন দেবতার হস্তে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা দেখা যায়। যেমন শিবের হাতে ত্রিশূল। নারায়ণের হাতে চক্র ইত্যাদি। তেমনি এই চিহ্নটি কোন বৈদিক দেবতার হস্তধৃত অস্ত্র বা লাঞ্ছনা। পূর্ব বর্ণিত সোহগৌরা গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রপটলিপির শীর্ষদেশে এইশ্রেণীর একটি লাঞ্ছনা আছে। তবে তার উর্দ্ধদেশ অনুরূপ। তবে এটিও যে একটি মাঙ্গলিক চিহ্ন তা নিঃসন্দেহ।

হাতী—এই চিহ্নটি চৌকা মুদ্রার একপৃষ্ঠে বিভিন্ন চিহ্নের সঙ্গে এবং ছোট গোলাকার মুদ্রার একপৃষ্ঠে একক ভাবে দেখা যায়। 'হাতী' অতি প্রাচীন যুগ হতে ভারতীয় জন্তু বলে প্রমাণিত। হিমালয় ছোটনাগপুর প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলে হাতী দেখা যায়। হাতীকে হিন্দুরা দেবতারূপে ও কল্পনা করেছেন। শিবপুত্র গণেশের মস্তকটি হাতীর মস্তক। গণেশকে বলা হয় সিদ্ধিদাতা, সমস্ত দেবতার মধ্যে গণেশই সর্বপ্রথম পূজা পেয়ে থাকেন হিন্দু জাতির নিকট। বিশেষ করে হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গণেশপূজা করে থাকেন। হাতী বা গণেশের অন্য নাম 'গণপতি'। গণপতি অর্থে গণের পতি অর্থাৎ গণ—দল বা জন সমষ্টি। অর্থাৎ জন সমষ্টির যিনি পতি বা অধিকর্তা। জনগণের অধিপতিই গণপতি। এখানে মুদ্রা পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ হাতীর চিহ্নটি দুই অর্থের দ্যোতক বলে মনে হয়। প্রথমতঃ

মৌর্য ও গুপ্ত নৃপতিগণ ভারতীয় ছিলেন তাই ভারতের ধর্মীয় দেবতার চিহ্নকে মুদ্রাপৃষ্ঠে স্থান দিয়ে ভারতীয় ধর্মচেতনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থে মৌর্য ও গুপ্ত নৃপতিগণ প্রায় সমগ্র উত্তরভারত জয় করেছিলেন। উত্তর ভারত তথা আর্যাবর্তের 'গণ' দের তাঁরা জয় করে তাঁদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। তাই নৃপতিগণ হয়েছিলেন 'গণেরপতি' বা 'গণপতি' আর এই গণপতির চিহ্ন স্বরূপ হাতীকে মুদ্রাপৃষ্ঠে স্থান দিয়েছিলেন।

মুদ্রাপৃষ্ঠের এই চিহ্নগুলি নিয়ে গবেষণার সময়, এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুদ্রাবিশেষজ্ঞ ও লিপিতত্ত্ববিদ প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার লেখককে জানিয়েছিলেন—

…ইন্দ্রাণীর মুদ্রাটি আধুনিক ব্রহ্মদেশীয় বলেই বোধ হচ্ছে। কালীও রাধাকৃষ্ণ মূর্তিযুক্ত বস্তুটি কালীঘাটের ন্যায় তীর্থে প্রাচীন টাকা বলে বিক্রীত হয়। punch-marked মুদ্রা মৌর্যপ্রভাতী যুগে প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী গুপ্তযুগেও তার ব্যবহার বন্ধ হয়নি।

তোমার উল্লিখিত চিহ্নগুলি punch-merked মুদ্রায় পাওয়া যায়। ওর মধ্যে শুভসূচক স্বস্তিক। দেবতা বা মন্দিরাদির সহিত সম্পর্কিত বৃক্ষবিশেষ এবং শুভসূচক। অন্যদুটিও মাঙ্গলিক চিহ্ন, তবে তাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। এ সম্বন্ধে আলোচনা যে নেই, তা নয়। তবে এখন পর্যন্তও গুলোর পরিচয় অনেকটাই অজ্ঞাত।…"

এই মুদ্রা ও তারপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ চিহ্নগুলি হতে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মৌর্যপ্রভাতী যুগ হতে আরম্ভ করে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে একসুসভ্যজাতি বসবাস করতো। তাঁরা ধাতুর ব্যবহার খুবভাল ভাবে আয়ত্ব করেছিল। সমাজে নানা শুভসূচক ও মাঙ্গলিক চিহ্নের প্রচলন ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা যে প্রাচীন 'গঙ্গারিড়ি' রাষ্ট্রের নাম করেছেন তা এই অঞ্চল। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলের নাম ছিল 'গঙ্গারাঢ়'। গঙ্গা ও তার উপনদীবেষ্টিত অঞ্চল।

মৌর্য সম্রাটগণ অধিকাংশ ছিলেন বৌদ্ধ কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন বৈদিক ধর্মের অনুরাগী। মৌর্যগণ বৌদ্ধ হলেও দেশবাসীরা অধিকাংশ ছিল বৈদিক ধর্মের অনুরাগী। যারজন্য মুদ্রাপৃষ্ঠে এইসব বৈদিক চিহ্নগুলি দেখা যায়। সম্ভবতঃ চিহ্নগুলি উভয় ধর্মের সাংস্কৃতিক মিলনচিহ্ন হতে পারে। চিহ্নগুলি ঐতিহাসিকদের নিকট অবহেলিত হয়ে আছে। আমি এদিকে অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

গাত্র রঙ্গোলি

মঞ্জুলা সরকার

উল্কি যেমন স্থায়ী চর্মচিত্র, তিলক তেমনি গাত্র চর্মের ওপর অস্থায়ী চিত্রণ। দেহচিত্র হিসেবে উল্কি এবং তিলক এক পর্যায়ভুক্ত হলেও, দুটির মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। প্রথমতঃ উল্কিতে প্রতীকচিহ্ন ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এটি মূলতঃ চিত্রধর্মী। অপরদিকে, তিলক সর্বতোভাবে প্রতীকধর্মী এবং আকৃতিতে রেখাভিত্তিক ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

প্রকৃতিগতবিচারে তিলক আল্পনা জাতীয় চিত্র বলে, এর অপর নাম 'গাত্র রঙ্গোলি'। মানবদেহের যে অংশগুলি সচরাচর অনাবৃত থাকে, সেই সব স্থানে তিলক রচিত হয়। ললাট সহ দেহের দ্বাদশ অঙ্গে ধারণীয় চন্দনের মত কোন প্রলেপের সাহায্যে অঙ্কিত যাবতীয় চিহ্নকে 'তিলক' বলে।

অমরকোষ গ্রন্থে তিলক প্রসঙ্গে 'তমাল পত্র', 'চিত্রক, এবং 'বিশেষক'—এই বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। তিলকের ব্যাকরণগত টীকা হল—(ক্লী) তিলবৎ তিলপুষ্পইব কায়তি কৈ-ক।

তিলক হল ধর্মীয় প্রতীকচিহ্ন। হিন্দু সমাজে কে গাণপত্য, কে সূর্যোপাসক, কে শৈব বা বৈষ্ণব অথবা শাক্ত তা পৃথক পৃথক তিলক দেখে চিহ্নিত করা যায়। প্রতিদিন স্নানান্তে শুচি হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে নূতন করে তিলক রচনা করাই বিধি।

প্রাচীন ভারতে, ভূর্জপত্র কেটে ললাটের তিলক রচিত হত। সে যুগে মেয়েদের কপোলে ও বক্ষে কুঙ্কুম বা ঐ জাতীয় বস্তু দিয়ে যে পত্রবৎ তিলক আঁকা হত তার নাম ছিল 'পত্রচ্ছেদ্য'। কথিত আছে দক্ষিণনায়ক ও প্রসাধনকলাকুশল বৎসরাজ ঐ জাতীয় তিলক রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

গাত্ররঙ্গোলির বিচিত্র ধারা আবহমান কাল থেকে বয়ে আসছে। সহজাত অলঙ্করণ চেতনা, স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ এবং যাদু তন্ত্রে গভীর বিশ্বাস থেকে আদিম মানব মনে জন্ম নিয়েছিল দেহকে চিত্রিত করার প্রবণতা। প্রাক্ বৈদিক যুগে অনার্যগোষ্ঠীর মধ্যে অস্থায়ী রঙ দিয়ে দেহকে চিত্র বিচিত্র করার রীতি ছিল এবং তারমুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজের গোষ্ঠীর লোককে সনাক্ত করতে পারা। এছাড়া দুষ্ট আত্মা এবং অপদেবতার কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যেও মানুষ নিজের আকৃতিকে নানা রঙের আঁকিবুকির আড়ালে লুকোত। এখনো ভারতবর্ষ, স্পেন, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বন্য আদিবাসীদের মধ্যে সারা দেহে রঙিন নক্সা আঁকার রেওয়াজ আছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী পুরুষেরা নিজেদের নানা রঙে চিত্রিত করে নৃত্যে অংশে নেয়। এক সময়ে রেডইণ্ডিয়ান ও নিগ্রোরা যুদ্ধে যাবার আগে নিজেদের দেহকে নানারকম অদ্ভুত নক্সায় আবৃত করত।

ভারতে অঙ্গচিত্রণের এই ধারা অনার্যলোক থেকে উত্তীর্ণ হল বৈদিকযুগ এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের যুগে। এযাবৎ যা ছিল স্বতোৎসারিত এবং বন্ধনহীন স্বাধীন, সেই দেহ-আলিম্পন এবার পৌরাণিক শাস্ত্রীয় বিধানে বাঁধা পড়ল। সম্ভবত এই পরিস্থিতিতেই পরিমার্জিত ও ধর্মসম্পৃক্ত অঙ্গরাগ 'তিলক' নামে চিহ্নিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে এখনো

পর্যন্ত হিন্দু সমাজে ভস্ম ও ঘি মিশ্রিত হোমের টিকা কপালে আর চিবুকের তলায়, গলা ও কণ্ঠার সংযোগস্থলে তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে লাগানোর রীতি চলে আসছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বিবৃত হয়েছে কোন আঙুল দিয়ে তিলক আঁকলে তার কি ফললাভ হয়। যেমন—বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে তিলক রচনা করলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, মধ্যমার দ্বারা রচিত তিলকে দীর্ঘায়ু, অনামিকায় সম্পদ এবং তর্জনীতে দাসত্বমোচন ও স্বাধীনতা লাভ ঘটে।

এই পর্বে তিলকধারণের ক্ষেত্রেও শাস্ত্রকাররা বর্ণভেদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। ফলে এর সঙ্গে কর্তব্য অকর্তব্য ও পাপপুণ্যের ভাবনা অনিবার্যভাবে জড়িয়ে গেল। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ 'আহ্নিকতত্ত্ব' থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে চারবর্ণের মানুষের জন্য পৃথক পৃথক চাররকমের তিলক নির্দিষ্ট ছিল, যথা—

ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজ কুর্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ডকং।
অর্ধচন্দ্রও বৈশ্যস্তু বর্তুলঃ শূদ্র যোনিজঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বপুন্ড্র করবেন, ক্ষত্রিয়ের জন্য ত্রিপুন্ড্রক তিলক, বৈশ্যের অর্ধাকৃতি এবং শূদ্রের পক্ষে বর্তুলাকার তিলক উপযুক্ত। মৎস্যসূক্তে ঊর্দ্ধপুন্ড্রের বর্ণনায় বলা হয়েছে নাসা থেকে কপাল ও চুলের সীমানা পর্যন্ত অঙ্কিত তিলককে ঊর্ধ্বপুন্ড্র বলে। এই তিলকে রঙের হেরফেরে ফললাভেও নাকি তারতম্য ঘটে, যেমন শ্যামবর্ণ ঊর্ধ্বপুন্ড্র শান্তিকর, রক্তবর্ণ বশ্যকর, পীতবর্ণ শ্রীবৃদ্ধিকর এবং শ্বেতবর্ণ মোক্ষপ্রদ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর ঊর্ধ্বপুন্ড্র তিলক বৈষ্ণবসম্প্রদায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এটির আকৃতিগত কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, যেমন বঙ্গদেশে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র উল্লম্ব রেখাদুটির নীচে, বাঁকের মুখে দুটি কোণ ক্রমে তাদের কৌণিকতা হারিয়ে অর্ধবৃত্তে পরিণত হয়েছে।

অপরদিকে শৈবগোষ্ঠী গ্রহণ করেছেন ক্ষত্রিয় ও কায়স্থদের ত্রিপুণ্ড্রক। ত্রিপুণ্ড্রক সম্পর্কে শঙ্করক্রমে প্রদত্ত সংজ্ঞা হল, ভস্মাদি দ্বারা কৃত কপালের তির্যক রেখাত্রয়ের নাম ত্রিপুন্ড্রক। শৈব-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে শ্বেতবর্ণের ভস্ম দিয়ে ত্রিপুন্ড্রক রচনা করলে সর্বপাপমুক্ত হয়ে শিবধামে গতি হয়। আর অসম্পূর্ণ ত্রিপুন্ড্রক ধারণ করলে যে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ শিবসাধকের চতুর্বর্গলাভ অসম্পূর্ণ থেকে যায় সে বিধান রয়েছে শঙ্কানন্দ তরঙ্গিণীতে।

তিলকধারণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য বিধিনিষেধ ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রে। ব্রহ্মপুরাণে আছে, দেহে তিলকধারণ না করে গোদান, অগ্নিতে আহুতিদান, ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠ ও মন্ত্র আবৃত্তি এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলে তার উদ্দেশ্য বিফল হয়। বাংলার লোকবিশ্রুত স্মার্ত রঘুনন্দন মহাভারতের একাংশে উদ্ধৃতি সহকারে বিধান দিয়েছেন, স্নানান্তে গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে এবং হোমের পর ভস্ম দিয়ে তিলক রচনা করলে চণ্ডাল বা অপর অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষকে দর্শনজনিত পাপের স্খলন হয়।

কিন্তু তিলকতত্ত্ব সম্পর্কে সব শাস্ত্রকারেরা যে একমত ছিলেন না, তা শাস্ত্রসমূহের পরস্পরবিরোধী উক্তিগুলি থেকে বোঝা যায়। আহ্নিক-তত্ত্বতে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর জন্য ঊর্ধ্বপুন্ড্র হলেও দেবীভাগবতয়ে তার বিপরীত বক্তব্য রয়েছে। শেষোক্ত রচনায় বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে শুধু ঊর্ধ্বপুন্ড্রই নয়, সেই সঙ্গে ত্রিশূল, বর্তুল, চতুরস্র বা অর্ধচন্দ্র চিহ্ন পর্যন্ত ধারণ নিষিদ্ধ হয়েছে।

ঊর্ধ্বপুন্ড্রং ত্রিশূলঞ্চ বর্তুলং চতুরস্রকং।
অর্ধচন্দ্রাদিবালিঙ্গং দেবনিষ্ঠা ন ধারয়েৎ॥

একবার শাস্ত্রকারেরা বলেছেন নারী, পতিত শূদ্র অথবা অন্ত্যজরা যদি ঊর্ধ্বপুন্ড্র ধারণ করে তবে তারা নরকপ্রাপ্ত হবে। আবার অন্যত্র বলা বলা হয়েছে যাঁর ললাটে ঊর্ধ্বপুন্ড্র শোভা পায়, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল হলেও শুদ্ধাত্মা পূজ্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তো সুস্পষ্ট ভাবে চণ্ডালের ঊর্ধ্বপুন্ড্র ধারণের কথা রয়েছে।

এতো গেল শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের শুষ্ক আলোচনা। এইবার মধুর রসাশ্রিত বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টি ফেরানো যাক। পদাবলী সাহিত্যে মুহুর্মুহুঃ তিলকের উল্লেখ চোখে পড়ে। বৈষ্ণবপদকর্তাগণ তাঁদের আরাধ্য দেবতার তিলকে ভূষিত অনুপম রূপ নানা ভাবে বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের তিলকলাঞ্ছিত রূপের বর্ণনা করে বলেছেন—

চন্দন তিলক অলকা আধ ঝাঁপল
হেরি নব ইন্দুক ভাতি॥

শ্রীরাধিকার রূপানুরাগমূলক একটি মল্লয়জ তিলকের উল্লেখ রয়েছে।—

মলয়জ তিলক ভাল পর বিলিখন
যাহা দেখি চাঁদ কলঙ্কী।

অপর একটি পদে রয়েছে মৃগমদ তিলকের কথা—

মৃগমদ বিরচিত তিলক বিরাজিত।

তিলকসেবা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের অবশ্য কর্তব্য। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম স্মরণ করে বৈষ্ণবগণ নিজেদের দেহের দ্বাদশ স্থানে তিলক রচনা করে থাকেন। ঐ দ্বাদশ স্থান ও দ্বাদশ নামগুলি হল যথাক্রমে—ললাটে কেশব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, বক্ষস্থলে মাধব, উদরে নারায়ণ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণবাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধরে (কাঁধে) ত্রিবিক্রম, বামপাশে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর বাম কন্ধরে (কাঁধে) হৃষীকেশ পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিতে দামোদর। দেহের এই দ্বাদশ সংস্থান এবং দ্বাদশ কৃষ্ণনাম পদ্মপুরাণ থেকে জানা যায়।

কিন্তু, ১৬৯২ খৃষ্টাব্দতে রচিত হরিভক্তিবিলাসে তিলক রচনার জন্য যে বারটি অঙ্গ নির্দিষ্ট হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যে দ্বাদশ কৃষ্ণ নামের উল্লেখ আছে, পদ্মপুরাণের সঙ্গে তাদের সবগুলি মেলেনা। হরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত তিলক সম্পর্কিত শ্লোকটি হল—

ললাটে কেশবং বিদ্যাত্রং কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্।
বামবাহৌ বাসুদেবং সব্যে দামোদরন্তথা।
গোবিন্দং দক্ষিণপার্শ্বে বামে চৈব ত্রিবিক্রমম্।
বিষ্ণুং সব্যে কর্ণমূলে দক্ষিণে মধুসূদনং।
শিরোমধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ।

অর্থাৎ ললাটে কেশব, কণ্ঠে শ্রীমধুসূদন, বামবাহুতে বাসুদেব, দক্ষিণবাহুতে দামোদর, নাভিতে নারায়ণ, হৃদয়ে মাধব, দক্ষিণে গোবিন্দ, বামেত্রিবিক্রম, বামকর্ণমূলে বিষ্ণু, দক্ষিণমূলে মধুসূদন, শিরোমধ্যে হৃষীকেশ আর পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভ নাম স্মরণ করে তিলক রচনা করা নিয়ম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পদ্মপুরাণ আর হরিভক্তিবিলাসের মধ্যে তিলক সম্পর্কে যথেষ্ট মত পার্থক্য

রয়েছে, অর্থাৎ দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে ললাট, নাভি এবং মস্তকের সঙ্গে যুক্ত নামগুলি ছাড়া উভয় শাস্ত্রের মধ্যে আর কিছুই মেলে না। দ্বিতীয়তঃ দেহের অন্তর্গত নয়, হরিভক্তিবিলাসে সেগুলিও তিলকের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

দেহের যে কোন স্থান থেকে তিলক অঙ্কন শুরু করা চলে না। প্রথমে ললাটে ঊর্ধ্বপুন্ড্র ধারণ করতে হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে শরীরের অপরাপর অংশ তিলকে শোভিত করা বিধিসঙ্গত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—বিষ্ণুর এই চারটি চিহ্ন তিলকের মোটিফ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নেত্রান্ত, গণ্ড এবং স্কন্ধে শঙ্খ চিহ্নিত তিলক স্থান পায়, আর দক্ষিণবক্ষে চক্র লাঞ্ছিত তিলক আঁকা হয়। ললাটের দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে মহেশ্বর আর মধ্যে বিষ্ণুর অবস্থান কল্পিত হয় বলে কপালের ঠিক মধ্যভাগ শূন্য রাখতে হয়।

'দ্বাদশাঙ্গে ললাটাদৌ হরিমন্দিরং' (হরিভক্তিবিলাস) অর্থাৎ ললাট সহ দ্বাদশ অঙ্গের তিলক 'হরিমন্দির' নামে পরিচিত। আবার মধ্যদেশে ছিদ্রযুক্ত শুধুমাত্র ঊর্ধ্বপুন্ড্রকেও হরিমন্দির বলে। কারণ এই তিলকের নীচের অংশ মন্দির দ্বারের 'পত্তন প্রস্তর' অর্থাৎ চৌকাঠের প্রতীক এবং উন্নম্ব রেখাদুটি মন্দির দ্বারের ইঙ্গিত করে।

বাঙলার বৈষ্ণবেরা ললাটে সচরাচর ছয় রকমের তিলক এঁকে থাকেন। এ ছাড়া আরও বহুধরণের বৈষ্ণব তিলক প্রচলিত আছে। এগুলির মধ্যে ছোট্ট কোঁটার মত তিলকটির নাম বিন্দু। এটি হিন্দু মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। বৈষ্ণব রমণীরা কপালে কুঙ্কুমের বিন্দু আঁকেন। এঁদের মধ্যেই বিন্দু তিলক বেশী প্রচলিত। বৈষ্ণব তিলকের সংখ্যাধিক্য ও বৈচিত্র্যের কারণ হল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার একাধিক বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী আছে, যেমন—শ্রী, চরণদাসী, বল্লভাচারী, বিট্ঠলভক্ত, নিম্বৎ, রামসনেহী ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এঁদের এক গোষ্ঠীর তিলক চিহ্ন অপর গোষ্ঠীর থেকে আলাদা। যেমন, 'চরণদাসী' সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা, তাঁদের কপালে চন্দন বা গোপীচন্দনের একটি দীর্ঘ রেখা থাকে। বৈরাগীরা কিন্তু নাসামূল থেকে শুরু করে কপাল ও চুলের সন্ধিস্থল পর্যন্ত ঊর্ধ্বপুন্ড্র আঁকেন। অপরদিকে 'শ্রী' বৈষ্ণবেরা কপালের ওপর থেকে নাসামূল অবধি দুটি ঊর্ধ্বরেখা টানেন এবং দুই রেখার নাসামূলস্পৃষ্ট উভয়প্রান্ত ভ্রূ মধ্যগত একটি রেখা দিয়ে যুক্ত হয়। ইংরাজী U হরফের মত এই ঊর্ধ্বপুন্ড্রের মধ্যস্থলে পীত অথবা লালবর্ণের অপর একটি ঊর্ধ্বরেখা স্থান পায়।

হলুদ বা লাল রেখাটানার জন্য অনেক সময়ে রুলি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া বুকে আর দুই বাহুতে গোপীচন্দন দিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিরূপ চিহ্নিত হয়। শঙ্খ বা অপর চিহ্নের মধ্যস্থ লাল তিলকটি হল শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীবহ্নি। ভগবান বিষ্ণুর চারটি প্রতীকের মোটিফ, শ্রী চিহ্ন এবং রাধিকার বিভিন্ন নাম খোদাই করা কাঠের ধাতব ছাঁচ বাজারে পাওয়া যায়। এগুলির সাহায্যে ছাপ দিয়ে দেহে অতি সহজেই তিলক রচনা করা সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতি শাস্ত্র বিরোধী। বৃহন্নারদীয়পুরাণে ছাঁচ দিয়ে তিলকের ছাপ তুলতে নিষেধ করা হয়েছে।

বাঙলার প্রতিবেশী বিহার প্রদেশে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিজস্ব অভিজ্ঞান স্বরূপ পৃথক পৃথক তিলক চিহ্ন রয়েছে। অবশ্য অধিকাংশই ঊর্ধ্বপুন্ড্রের অল্পবিস্তর পরিবর্তিত রূপ। আবার কতকগুলি তিলকের আকৃতি অনেকটা ত্রিশূলের মত।

বিহারের 'রামানুজ' মতাবলম্বী বৈষ্ণবদের তিলকটি বৃহদাকার। ললাটে ধারণীয় এই তিলকের বহিরেখা সাদা, তার ভিতরে থাকে লাল অথবা হলুদ রঙের 'শ্রী' চিহ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বাঙন' নামে পরিচিত তিরুত্তের ভূমিহার ব্রাহ্মণেরা যে তিলকটি ধারণ করেন, সেটি উপরিউক্ত রামানুজ তিলকেরই একটি বিশেষ রূপ।

উড়িষ্যার 'রামানন্দী' বা 'রামাৎ' গোষ্ঠীর তিলকের সঙ্গে 'শ্রী' সম্প্রদায় আর রামানুজ গোষ্ঠীর তিলকের কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তফাৎও রয়েছে। কারণ রামানন্দীরা নিজের রুচি অনুযায়ী ঊর্ধ্বপুন্ড্রের অন্তবর্তী রেখার রূপ আর আয়তনের অল্প-স্বল্প বদল করে থাকেন। 'রামানন্দী' তিলক 'রামানুজী' তিলকের থেকে কিছু হ্রস্ব। আর রামানন্দী তিলকের কেন্দ্রস্থ 'শ্রী' চিহ্নটি রামানন্দী তিলকের মত লাল অথবা হলুদ নয়, সম্পূর্ণ সাদা।

নিম্বৎ সম্প্রদায়ভুক্ত হরিব্যাসীদের আদি অবস্থান হল ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে মৃগীপট্টন নামক স্থানে। এঁদের তিলক রামানন্দী তিলকেরই মত। তবে এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বপুন্ড্রের মধ্যস্থলে নানা রঙের 'শ্রী' চিহ্ন থাকে না। তার বদলে দুই ভ্রূর মাঝখানে কালো মাটি দিয়ে ছোট্ট একটি বিন্দু আঁকা হয়। এই বিন্দু 'শ্যামবিন্দী' নামে পরিচিত। কখনো কখনো শ্যামবিন্দীর বদলে গোপীচন্দনের সাদা টিপও দেওয়া হয়।

রামানন্দী তিলকে দুই ভ্রূর সামান্য নীচে আর নাকের ঠিক ওপরে গোপীচন্দনে লিপ্ত অর্ধ-বৃত্তাকার অংশটুকুর নাম 'সিংহাসন'। হরিব্যাসীরা ঐ রকম সিংহাসন না করে, শুধু রেখা দিয়ে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকেন, যার উভয় প্রান্ত ঊর্ধ্বপুন্ড্রের তলার অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

রামাৎ সম্প্রদায়ী রামপ্রসাদীরা দুই ভ্রূর কেন্দ্রস্থলে কালোবিন্দু না দিয়ে, কপালের ঠিক মাঝখানে একটি শ্বেত বিন্দু আঁকেন। এই বিন্দুটি আকারে হরিব্যাসী তিলকের বিন্দুর থেকে কিছু বড়। রামপ্রসাদী তিলকের অপর নাম 'বেণী তিলক'। রামপ্রসাদী গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রবাদ চলিত আছে যে, স্বয়ং সীতাদেবী রামপ্রসাদের কপালে এই তিলক এঁকে দিয়েছিলেন।

বড়গল্ নামে রামাৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামপ্রসাদী তিলকের মত বিন্দু না করে, রামানন্দীদের মত ঊর্ধ্বপুন্ড্রের মাঝখানে নানা রঙে 'শ্রী' চিহ্ন রচনা করেন। কিন্তু নাকের ঠিক ওপরে সিংহাসন করেন না।

রামাৎ সম্প্রদায়ের লস্করী বৈষ্ণবেরা রামানন্দীদের মত সিংহাসন করলেও, রক্তবর্ণ 'শ্রী'র বদলে শ্বেতবর্ণের শ্রী আঁকেন। অতীতে সম্ভবত যুদ্ধে অংশ নিতেন বলে এঁরা 'লস্করী' নামে পরিচিত।

চতুর্ভুজী গোষ্ঠীর তিলক রামানন্দী তিলকেরই মত; শুধু তফাতেয় মধ্যে এতে ঊর্ধ্বপুন্ড্রের কেন্দ্রে শ্রীচিহ্ন থাকে না। ঐ অংশ শূন্য থাকে।

মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব তিলক চিহ্ন আছে। মাধবাচারী তিলকের ভিতরের রেখা কালো, বাইরের রেখা সাদা। এই তিলক কপালের অগ্রভাগ থেকে নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত লম্বিত হয়। গয়াধামে এই মাধবাচারী তিলকের পাশাপাশি অপর যে তিলকটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটির নাম 'গঙ্গাচার্য'। গয়ার আচারি বৈষ্ণবেরা এই তিলক বেশী গ্রহণ করেন।

বল্লভাচার্যের মতাবলম্বী গোষ্ঠী বল্লভাচারী নামে পরিচিত। এই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের তিলকের নাম বল্লভাচার্য। এই তিলক আঁকার সময়ে ভক্ত দুটি উর্দ্ধপুনড্র রচনা করে, তাদের দুই প্রান্ত নাসামূলে অর্ধ চন্দ্রাকার রেখা দিয়ে যুক্ত করে দেন। দুই পুনড্রের মাঝে থাকে একটি রক্তবর্ণ বৃত্ত। কোন ভক্ত লালবৃত্তের বদলে শ্যামবিন্দী নামে কালোমাটি বা অন্য কোন বস্তু দিয়ে মণ্ডল আঁকেন। 'শ্রী' বৈষ্ণবদের মত বল্লভাচারীরাও বাহু আর বুকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মচিহ্ন আঁকেন।

সনকাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ নিমাতেরা কপালে গোপীচন্দনের উর্দ্ধপুনড্র এঁকে তার কেন্দ্রস্থলে কালো রঙের একটি মণ্ডল রচনা করেন।

বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্যগণের আত্মীয়-পরিজন, বংশধর ও শিষ্যবৃন্দ নিজেদের অভিজ্ঞানস্বরূপ আলাদা আলাদা তিলকচিহ্ন ধারণ করেন। যেমন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট তিলকের প্রচলন আছে। তাদের একটি আবার বেণু আকৃতি।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর অনুগামীদের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে তিন প্রকারের তিলক প্রচলিত। একটি তিলকের নিম্নভাগ বটপাতার আকৃতিবিশিষ্ট বলে সেটি 'বটপত্র' নামে পরিচিত। অপর একটি তিলকের নাম নূপুর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গদাধর প্রভুর ভক্তবৃন্দও এই নূপুর তিলক ললাটে ধারণ করেন।

বলা বাহুল্য যে ভারতীয় অলঙ্কারের অন্যতম হল নূপুর। এটি মুখ্যতঃ নারীর চরণশোভা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পাদপদ্মেও নূপুর বিরাজ করে। মনে হয়, আরাধ্যদেবতার চরণ শিরে ধারণ করার ইঙ্গিত দিতেই নূপুর তিলকের জন্ম। এই প্রসঙ্গে নূপুর তিলক ও নূপুর অলঙ্কারের আকৃতিগত ঐক্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তফাতের মধ্যে, তিলকে নূপুরের অর্ধেক আঁকা হয়, বাকি অর্ধাংশ যোগ করলেই উভয়ের অভিন্নতার কোন সন্দেহ থাকে না।

আচার্য প্রভুর পরিবার তিলপুষ্পাকৃতি তিলক সেবা করেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের বংশে 'রসকলিকা' তিলক প্রচলিত। এই তিলক নাকের ওপর আঁকা হয়।

শৈবরা ললাটের বামদিক থেকে দক্ষিণে সমান্তরাল রেখা এঁকে পরস্পরের প্রান্তগুলি অর্ধ বৃত্তকারে জুড়ে দেন। ত্রিপুনড্র নামে পরিচিত এই তিলকের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে ত্রিপুনড্র তিলক শুধু একটিমাত্র আকৃতিবিশিষ্ট হয় না। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট বৈচিত্র বর্তমান। ত্রিপুনড্র তিলকগুলির কয়েকটি সরল সাদাসিধে; কতকগুলির নক্সা একটু জটিল। ভস্ম দিয়ে রচিত যে ত্রিপুনড্র তিলকটি তিরহুতে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, সেটি বৈদ্যনাথধামের পাণ্ডাদের এবং মৈথিলী ব্রাহ্মণদের কপালে সর্বাধিক চোখে পড়ে। এই বিশেষ তিলকটির সঙ্গে সাঁচীর তোরণের নক্সার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

শাক্ত গোষ্ঠীর ও স্বতন্ত্র তিলক আছে। এতে ভস্ম দিয়ে ত্রিপুনড্র আঁকতে হয়, কিন্তু নীচের বিন্দুটি হয় রক্ত বর্ণের।

বিহারে কবীরপন্থীরা রক্তবর্ণের উলম্ব রেখাবিশিষ্ট তিলক ধারণ করেন। শিওনারায়ণ গোষ্ঠীর তিলক হল কৃষ্ণবর্ণের উর্ধ্বরেখাবিশিষ্ট। নানকপন্থী এবং গণপতিদের নিজস্ব তিলক রয়েছে।

উড়িষ্যায় প্রায় ৪০।৫০ রকম তিলকের সন্ধান মেলে। এগুলির মধ্যে নটি হল প্রধান। এদের মধ্যে রয়েছে আলিবাধি সম্প্রদায়, অদ্বৈতাচার্য মতাবলম্বী, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় এবং মাধবাচার্য, আচার্য ও রামানন্দী গোষ্ঠীর তিলক। শেষোক্ত দুটি গোষ্ঠীর তিলকের বহিরেখা সাদা ও অন্তরঙ্গ রেখা লাল।

তিলকের সংখ্যাও যেমন অগণ্য, সেগুলির রচনার উপকরণ ও তেমনি বৈচিত্রপূর্ণ। উপকরণের মধ্যে রয়েছে যজ্ঞভস্ম, তীর্থমৃত্তিকা- যজ্ঞকাষ্ঠ, বিল্ব, অশ্বত্থ আর তুলসীমূল মৃত্তিকা, মহানিম ও তুলসীকাষ্ঠ মৃত্তিকা, গন্ধকাষ্ঠ, ধাত্রীমূল, গঙ্গামাটি, গোময়, গোরচনা, গোপদমৃত্তিকা, অগুরু, শ্বেত ও রক্তচন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম ইত্যাদি।

বৈষ্ণবেরা সাধারণতঃ গোপীচন্দনের তিলক ধারণ করেন। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের ২৬ তম অধ্যায় থেকে জানা গেছে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে বিভিন্ন তিলকদ্রব্যের মধ্যে দ্বারকার গোপীচন্দন আর ব্যঙ্কটাদ্রিস্থ সরোবরের মৃত্তিকাই হল শ্রেষ্ঠ। শৈব তিলকের মুখ্য উপাদান হল শ্বেতবর্ণের ভস্ম। ভবিষ্যৎপুরাণ মতে যজ্ঞ ভস্মের অভাবে মাটি, চন্দন এমন কি জল দিয়ে পর্যন্ত তিলক রচনা করা চলে।

উপকরণের উপাদান থেকে বোঝা যাচ্ছে সব তিলকের রঙ এক নয়। গোপীচন্দনের তিলক শ্বেতশুভ্র, শ্যামবিন্দী মৃত্তিকার রঙ কালো। হলুদ, সোহাগা আর লেবুর রস একত্রে মেশালে হয় পীতবর্ণ। আর তারই মধ্যে সোহাগার ভাগ বেশী দিলে টকটকে লাল রঙ মেলে।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ তিলকের, বিশেষ করে বৈষ্ণব তিলকগুলির দুটি করে অংশ রয়েছে। ওপরের অংশ হল উর্ধপুনড্র, আর নীচের অংশটি হয় কখনো পত্রাকৃতি কখনো ফুলের মত, কখনো বা সুপরিচিত কোন অলঙ্কারের অনুরূপ। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, স্ব স্ব আকৃতি অনুযায়ী তিলকের নামকরণ হয়েছে, যেমন—বেণুপত্র, বটপত্র, তিলপুষ্প, নূপুর ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি জগতের যে ফুল, ফল, লতা, পাতার মোটিফ এবং সৌর জগৎ ও প্রাণী জগতের যে সব বস্তুর মোটিফ অলংকৃত করেছে ভাস্কর্যকে, স্থাপত্য এবং চিত্রকলাকে, সমৃদ্ধ করেছে আল্পনাকে, স্থান পেয়েছে কাঁথায়, ফলকের কারুকার্যে, মৃৎপাত্রের গায়ে, বাঙলার মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণে, ধাতব অলঙ্কারে এমনকি মিষ্টান্নের ছাঁচে, সেই মোটিফগুলিরই পুনরাগমন ঘটেছে তিলকের জগতে। অবশ্য এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তারতম্যে সেগুলি আরও সংশ্লিপ্ত, প্রতীকধর্মী ও সাঙ্কেতিক হয়ে উঠেছে।

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা যে কতখানি পরস্পর নির্ভর এবং স্থাপত্যশিল্পও যে চিত্রকলাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে, তার সুনিশ্চিত প্রমাণ হল ভারহুত তোরণশীর্ষের আদলে নক্সায়ত তিরহুতের সেই শৈব তিলকটি।

বিস্মৃত আর এক পদকর্তা—সতীশচন্দ্র

সুভাষ পাঠক

বন্য-কুসুম বিকশিত হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে, সকলের অগোচরেই ঝরিয়া পড়ে সেগুলি ধরণীর বুকে। কোন বনচারী পথিক হয়তো সেগুলির মৃদু সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে সুগন্ধ আধারটির সন্ধানে। গৈরিক-বসনা বীরভূমির কাব্য-কাননে কত কবি, কত পদকর্তা বন্য-কুসুমের মত নিজেদের বিকশিত করিয়া সৌরভ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহার বোধকরি হিসাব নাই। হয়তো তাঁহাদের ভণিতাসম্বলিত দুই একটি পদ গীত হয় আজও বাউল-বৈষ্ণবের কণ্ঠে। আর সেগুলির দুই একটি অর্ধ-বিস্মৃত কলি কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া ভক্ত-হৃদয়কে আকুল করিয়া তোলে। দুঃখের বিষয় সঙ্গীতের গায়কও বর্তমানে মুষ্টিমেয়, আর শুনিয়া রসগ্রহণ করিবার হৃদয় তো দুর্লভ। আজ এই হৃদয়হীন যন্ত্রযুগে মানুষ দেহ-ক্ষুধাসর্বস্ব—পেটপরণের সুরাহার জন্য সে সদাসর্বদা ব্যস্ত—তাহার মনের সারল্য শুষ্কপ্রায়—হৃদয়ের বিশ্বাস হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নাস্তিক্যবাদ চিরন্তন হইতে পারে না। মানুষ আবার ফিরিবে—কর্মশক্তির সঙ্গে জ্ঞান, ভাগ্য ও ঈশ্বরকে মিশাইয়া বিনা প্রতিবাদে—বিনা কোলাহলে সংযতপদে সংসারপথে আবার হাঁটিতে শিখিবে। তখন এই অমূল্য পদগুলির আদরও হয়ত হইবে। কিন্তু এখনই এইগুলি সংগৃহীত এবং রক্ষিত না হইলে চিরকালের মত ঐ রত্নগুলির বিলুপ্তি ঘটিবে, তাহা নিশ্চয়।

বর্তমান প্রবন্ধে এই রূপ একজন পদকর্তার কথা বাংলার সুধী-সমাজ এবং ভক্তজনের দরবারে উপস্থাপিত করিবার অক্ষম প্রয়াস পাইতেছি। এই কবির নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম তাঁহার বীরভূমের চৌহট্টা গ্রামে। জন্মের কাল ১২৭৬ সালের চৈত্র মাস। 'বীরভূমি'র মতও ঐ একই। কিন্তু সঠিক জন্মতারিখটির হদিশ পাওয়া যাইতেছে না। মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধেও রহিয়াছে মতান্তর। কেহ বলেন—১৩২২ বঙ্গাব্দের ১৩ই অগ্রহায়ণ, কাহারও মতে ১১ই, যাক্, তারিখ দুটির ব্যবধান সামান্যই।

তাঁহার কাব্যের বিষয় চিরন্তন—সেই শ্যাম—সেই শ্যামা। শতাধিক বৎসর আগে গানের বিষয় আর কিই বা ছিল। তাই কেহ কেহ বলেন সতীশ নীলকণ্ঠ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত-কবির অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কাব্য ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ তো বিষয়বস্তুতে নয়—অনুভূতির সার্থক রূপায়ণে। অনুভূতির সঙ্গে বাণীর—ভাবের সঙ্গে ভাষার সমন্বয়েই গড়িয়া ওঠে সার্থক কাব্য। মহাকবি কালিদাস, সুকবি ভবভূতি তাঁহাদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু বাল্মিকী-বেদব্যাস হইতে গ্রহণ করেন নাই? বর্তমান কালের মহাকবি মধুসূদনও তাঁহার কাব্যের কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের সাহিত্যকীর্তি কি অনুকরণের ফসল? তাহা হইতে পারে না। সুতরাং সতীশ অনুকরণ করেন নাই—করিয়াছেন পূর্বসূরীদের অনুসরণ। এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সতীশ যে রসোত্তীর্ণ কবি তাহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে কালের কষ্টি পাথরে। আজিও বাউল বৈষ্ণব গায়কদের কাছে বীরভূমের একটি বিরাট অঞ্চলের সাধারণ জন সতীশের পদ শুনিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া থাকে।

বীরভূম শাক্ত ও শৈবের মহামিলনক্ষেত্র। এই মাটিতেই মহাশাক্ত সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনাঙ্গন তারাপীঠ—আবার একদা জয়দেব, চণ্ডীদাস, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মধুর কণ্ঠস্বর বীভূমেরই আকাশ পাতাল মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। শাক্তের বীর্য, বৈষ্ণবের হৃদয় মাধুর্য—এই দুয়ের সার্থক বিগ্রহ যেন সতীশচন্দ্র। তাঁহার মধুর পদগুলির এই ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ। তিনি একাধারে 'ঘোর শাক্ত, পরম বৈষ্ণব এবং ভক্ত শৈব।'

চৌহট্টা গ্রামের পশ্চিমে রহিয়াছে 'চন্দ্রচূড়' মন্দির। এইটিই ছিল সতীশের সাধনক্ষেত্র। এই চন্দ্রচূড় মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া নিরুপায় সতীশ আক্ষেপ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

'হে প্রভু পিনাকী—ভগ্নচূড়া দেখি ঝরে দু'টি আঁখি হয় না নিবারণ

* * * *

নয়ন থাকতে অন্ধ রাজা-প্রজাকুল
নইলে কেন ভাঙ্গা রহিবে দেউল
(তাদের) গাড়ে দিনে দিনে বিষয় তরুমূল
হয় না শঙ্কাকুল স্মরিয়ে মরণ'।
'দীনসতীশের সাধ্য থাকিলে হে ভব
মন্দির তব হ'ত অভিনব
(কিন্তু) করেছ দরিদ্র দারিদ্র্যব্রতে!
শ্রীপদপল্লবে সবেমাত্র-ধন'

কখনও মহাশাক্ত সতীশ শ্যামামায়ের রূপবর্ণনা করিয়াছেন—

'লজ্জা ভয় ত্যজি নাচিছে কে বামা,
উন্মাদিনী উলঙ্গিনী কে ওই
রূপ দরশনে বাসনা হয় মনে
বামার চরণে বিকায়ে রই।
গভীর নাদিনী উন্মাদিনী রণে,
কাঁপিছে মেদিনী কণ্ঠস্বর শুনে,
সাধক সন্তানে রাখিতে যতনে,
প্রসরবদনে বলে মাভৈঃ।'

সতীশের বড় সাধ তিনি মায়ের ব্রহ্মনৃত্য দেখিয়া মানবজীবন সার্থক করিবেন। জন্মজন্মান্তরের আশার নিবৃত্তি করিবেন। তাই ব্রহ্মময়ীর চরণে তাঁহার মিনতি—

'একবার তেম্‌নি তেম্‌নি করে
নেচে নেচে শ্যামা নেচে আয়,
যেমন নেচেছিলি হর হৃদি' পরে
হেম নূপুর বাজায়ে পায়।,

মা নাচিবেন—ভক্ত দেখিবেন—দেখিয়া জীবন সার্থক করিবেন। কিন্তু সাধনার সময় যে বড় অল্প—

অচিরেই মৃত্যু হয়তো তাঁহার জীবনের উপর কাল যবনিকা টানিয়া দিবে। তাই দুঃখভরে সতীশ মায়ের দরবারে আক্ষেপ জানাইয়াছেন :—

'দেখিবার বড় সাধ আছে মা
(কিন্তু) সাধনার নাহি কাল,
(একবার) নাচো নাচো সুখে ব্রহ্মময়ী শ্যামা
বাজায়ে ব্রহ্মতাল।'

কিন্তু সন্তানের মনোবাঞ্ছা যদি মা পূরণ করেন—যদি ব্রহ্মনৃত্য করিতে করিতে 'আদরিণী শ্যামা মা ক্লান্ত হইয়া পড়েন তবে বিশ্রামের জন্য সতীশ হৃদয়-আসন ত পাতিয়াই রাখিয়াছেন—

'নেচে নেচে যদি জননী গো, শ্রমজল ঝরে তোর
(তবে) সুখে শিব সনে লভিবি বিরাম হৃদয় আসনে মোর।
সঙ্গিনীগণ—করিবে বায়
সতীশ সাদরে সেবিবে পায়
পার হ'তে দেমা শ্রীপদতরণী, হে ভবঘরণী, এভবদায়।'

মাগত প্রাণ মহাভক্তের এই গভীর আকুলতা অতুলনীয়। এই আকুলতার সঙ্গে মধুর বেগবতী ভাষার সমন্বয়ে—প্রসাদগুণে—পদটি উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিকাব্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মাতৃভক্ত সতীশ তাঁহার মাকে দূর হইতে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেন নাই। তিনি যেন মায়ের কোলের কাছাকাছি না গিয়া শোয়াস্তি পান না। তাই কবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

'আর কিছু তোরে চাহিনা মা, বারেক হেরিতে চাই,
জনমের সাধ মিটাইবো জননী, কোলে যেতে যদি পাই।'

যদি কবি মায়ের কোল পান তবে মরণে তাঁহার ভয় কি! সেইদিনে যেদিন শমন শিয়রে দাঁড়াইবে—যেদিন অন্ধকার ভয়াল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মরণসাগর কল্লোলিত হইবে—সে দিনেও কবি অকুতোভয়! মহাশক্তির আধার ভবতারিণী মা যে তাঁহার সঙ্গে আছেন! তাই কবি ভীত মনকে প্রবোধ দিয়াছেন—

'সেদিন আমার মা আছেরে আমি যে মায়ের ছেলে
কৃতান্তে তুই ডরাস না, মন, নিতান্ত ভয় দেখাইলে।'

তাঁহার অবোধমনকে প্রবোধ দিয়া তাঁহার মায়ের প্রতাপের কথা শুনাইছেন—

'জানিস্ না মোর মায়ের প্রতাপ
শুনিয়ে পালায়রে ত্রিতাপ
বরদাত্রী দেয় না তাপ
বয় না রে পাপ ও নাম নিলে।,

মাতৃগরবে গরবিত মহাভক্ত সতীশ শমনকেও উপদেশ দিতে ছাড়েন নাই। তিনি যমকেও উপদেশ দিয়াছেন—

'সতীশ কয় যম আসবি আসিস্
ভাই বলে ভাই কাছে বসিস্
শেষ ডাকার সময়ে ডাকিস্
নিজেও ডাকিস্ মা বলে।'

ত্যাগ, জীবে দয়া ও প্রেমভক্তির মধ্য দিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই হইল সতীশের ধর্মমত। তাই তিনি বলেন :—

'ত্যজ কনক, ত্যজ কাঞ্চন, ত্যজ বিষয়, ত্যজ মায়া,
মজো মুরারী পদারবিন্দে জগৎজীবে ক'রো দয়া।
* * *
ধর্মাধর্ম সব কর্ম সমর্পণ করিয়া তাঁকে,
হা গোবিন্দ বলে ডাক যেন কামগন্ধ নাহি থাকে।'

ভক্তিশূন্য আচার সর্বস্ব তন্ত্র সাধকদের তিনি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন :—

'আড়ম্বরী ঘটায় কপাল জোড়া ফোঁটায়
মদের বোতল পাঁঠায় ভুলবে না ক'মা,
(যতোই) মা মা বলে ডাকো চেঁচাও মাথা ঠোকো
কারো কথায় মা কাড়বে তো রা।'

তাহা হইলে করিতে হইবে কি?—পথের নির্দেশও দিয়াছেন তিনি :—

'সতীশ বলে যেদিন ফিরবে জগৎভ্রমি
ভক্তি নিক্তি কাঁটায় মরবে বেশী-কমি
যদি প্রেম সিন্ধু মথি হতে পার প্রেমী
(তবে) বুঝবে কোথায় তুমি কোথায় তোমার মা।'

প্রেম, ভক্তি নিঃশেষে আত্মনিবেদনই সতীশের মতে সর্বধর্ম সার।

এবার রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলির কিছু পরিচয় নেওয়া যাক্। সতীশ শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিতেছেন :—

'কে কপট লম্পট নবীন-রাজ শঠ বসি যমুনাতট নিকট বংশীবট বিটপীতে
হেরিলে পর চরণ সরোরুহে আদর করে কেবা—
প্রভাকর প্রখর-কর জিনি নখর কর প্রভা,
তদুপরি নূপুর নর-সুর-ত্রিপুর মনোলোভা,
বাড়ে লালসা বদন শোভা রজনী দিবা নিরখিতে।'

* * *

আরও :— 'গীন কেতন মনোমোহন বন প্রসূন মালা গলে,
নাসাভূষণ দোলে সঘন মৃদু পবন অনুকূলে
হীরা খচিত হেম রচিত চূড়া ঈষৎ বামে হেলে

সতীশ বলে সকল ভুলে চরণ মূলে বিকাইতে।'

কিন্তু এই রূপ ত সর্বনাশা। যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে। তাহারই কপাল পুড়িয়াছে। কুলে কালি পড়িয়াছে। এইরূপ দেখিয়া শ্রীমতী রাধার কি অবস্থা তাহা ভক্ত কবির লেখনীতে শ্রীমতীর জবানীতে শুনুন :—

'হলো সখি! কুল রাখাদায় রইল না আর মন খাঁটি
গেলাম ভুলে গিয়ে কুলে, কুলে পড়ল ছাই মাটি।'

শুধু এই টুকুই নয়। শ্রীমতীর আরও সর্বনাশ হইয়াছে।—

'চোখে চোখে সখি—হয়ে দেখাদেখি—মাখামাখি হয়ে গিয়েচে মন,
সাধাসাধি করে ফিরাতে না পেরে সঁপিয়াছি তারে প্রাণমন।'

তবে আর কুলবধূর সর্বনাশের বাকি রহিল কি! সতীশ যেন শ্রীমতীকে বলিতে চান—'ভয় করো না শ্রীমতী যাহা তুমি পাইয়াছ সেই অরূপরতন শ্রীকৃষ্ণ তো দুর্লভধন! আমি পাইলে কি করিতাম জান?'—

'সতীশ কয় ক'ব কোনজনে
আমি জানি আমার মন জানে
পাই যদি মনোরঞ্জনে
গুরুগঞ্জন করি আভরণ'

সেই অরূপরতন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করিতে প্রকৃতি যেন নবসাজে সজ্জিতা। রূপবর্ণনা করিয়াছেন সতীশ :—

'তরুতে লতাতে কুসুমে পাতাতে সোহাগে মাতা'তে সমীর বয়গো
হাসিতে বাঁশীতে শশীতে নিশিতে মিশিতে মিশিতে উদয় হয় গো।
কুসুমে ভ্রমরা গুমারে গুমারে,
ডাকিছে সাদরে যশোদা কুমারে;
কোকিলা ফুকারে কামিনী লুকারে:
মদন বিকারে দারুণ ভয় গো।

কুল বধূর ভয়ের বস্তু বটে। কিন্তু সতীশ কি করেন?

'যমুনা কুলমে কুঞ্জ বনমে
নেহারি নয়নে নবীন ঘন মে
মনমে মনমে সতীশ প্রণমে—
(যেন) জনমে জনমে দেখা হয় গো।'

সারারাত্রি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কাটাইয়া 'নীলরতন' শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে শ্রীমতী কুঞ্জের দ্বারে চোরের মত দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সখী ভর্ৎসনা করিয়াছেন :—

'চোরের মতন ও নীলরতন এসোনা কুঞ্জদ্বারে,
মিছে এলে বঁধু, এতে নাই মধু, যাও যাও শুধুফিরে।

যেথা ছিলে সুখে যাও সেইমুখে, মোরা মনোদুখে সরিয়া যাই,
(সারা) যামিনী জাগিয়ে মরমে মরিয়ে গিয়েছে রাই,
সরম হ'ল না আসিতে কি? মধু মেলে কভু বাঁশীতে কি?
বাসি কেন চাও নূতনেতে যাও নূতন রাগের ভরে।

সখী অনুরোধ জানাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকে :—

'আর আলা কালা দিও না হে প্রাণে
অবলা সরল প্রাণ
তরল বাঁশীতে বাজায়ো না আর
গরল মাখানো গান।'

ছি! ছি! লজ্জা করে না। পুনরায় সখী আক্ষেপভরে বলিয়াছেন :—

'(বলো) কি দোলায় দোলালে যশোদা দুলালে
কি সে মন ভুলালে সাধের চন্দ্রাবলী?
জানতাম রাধিকার পূর্ণ অধিকার
কত অধিক আর করব বলাবলি!
রাধা প্রেমের দায় কিনেছ হে নাম,
রাধাকান্ত, রাধাকৃষ্ণ, রাধাশ্যাম
(তবে) এ ঘটনা কেন ঘটল ঘনশ্যাম
(মোরা) লাজে দুখে ম'লাম দেখে গলাগলি।'

কটাক্ষ করিয়াছেন সখী :—

বলো, বলো, দুটো গুণবতীরগুণ—কইতে কথা কেন মুখটি কর চুণ
মিলে নাই চুণ নিতে চুণকালি।
হয়েছিল এত পিপাসা প্রবল—বিচার নাইকি, হরি, ভাল মন্দ জল
আকাল কি তাই তুমি খেলে মাকাল ফল
আচ্ছা প্রতিফল দিলে বনমালী।'

ভৎর্সিত হইয়া লজ্জায় অধোবদনে কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন। সখী রাধাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিয়াছে যে সে সেই কালো, নিষ্ঠুর, শঠ কালাচাঁদকে নিষ্ঠুর বাক্য বাণে বিদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। সখি কিনা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে কালো, নিষ্ঠুর, শঠ বলিয়াছে। ইহা কি রাধার প্রাণে সহ্য হয়? রাধা বলিয়াছেন :—

'বলো না সখি শঠ, কঠিন কপট, নিঠুর লম্পট শ্যাম নটরাজে।
শুনিতে হেন কথা' শেল যায় গাঁথা দারুণ পাই ব্যাথা মরম মাঝে।
সখির নয় আঁখি ভাল কুলো যে বলে তারে,
সে কালো আমার অন্তর আলো করে;
পরমসুন্দর রসিক নাগর করুণা সাগর ধরণী মাঝে।

যে ভালবাসে তারে সে ভালবাসে তায়,
তার ভালবাসায় কে না কেনা যায় ;
সতীশ সদা চায় কেমনে ভুলি তায়
বাসনা বনে যাই হেরিতে বাস তাহে।'

রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদগুলিতে প্রেমের রহস্যময় সন্ধিগুলি নিপুণ হস্তে জরিপ করিয়াছেন কবি। গভীর অনুভূতি, অনুপ্রাস, যমক অলংকারে ভূষিত হইয়া ভক্তিরসে সিঞ্চিত হইয়া কবির অজ্ঞাতসারেই উন্নতস্তরের উপাদেয় কাব্যসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। অধিক অনুপ্রাসের প্রয়োগ অনেক সময় শ্রুতি কটুত্বের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচিত, পদগুলিতে অনুপ্রাসের প্রয়োগ সুশ্রাব্য অলঙ্করণে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু পরিণামে কবির হৃদয়পুরে শ্যামা ও শ্যাম মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন। দ্বৈত এক এবং অদ্বিতীয়তে পরিণত হইয়াছে। শ্যাম শ্যামারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন :—

'মনোচোরা মোহনচূড়া পাই না কেন হেরিবারে
হয়েছ হরি দিগম্বরী কেন হে পীতবাস ছেড়ে ?
(একী) সদ্য-ছিন্ন-শিরোরক্ত-মদ্যপানে মাতোয়ারা,
(ব্রজে) মায়ের দেওয়া ক্ষীর ননী খেতে যে তুমি ননীচোরা।
বনমালা কই বনমালী ?
হয়েছো নুমুণ্ডমালী,
ভক্তাধীন হয়েছ কালী শক্তি উপাসকের তরে।'
পুরুষ ত্যাজে প্রকৃতি সেজে আকৃতি লুকায়েছ হরি,
(অঙ্গের) বিকৃতি তব হয়েছে শব (কিন্তু) কালো ঘোচে নাই হে কালবারী ;
ছিলে শ্যাম হয়েছ শ্যামা,
ধরেছ রূপ নিরুপমা,
প্রেম-ময়ী হেম প্রতিমা রাধা যে শব রূপে পড়ে।

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে করালবদনী ভয়ঙ্করী শ্যামা মোহনচূড়াধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। অমান ভক্ত কবি মহানন্দে গাহিয়া উঠিয়াছেন :—

'বল মা শ্যামা শবাসনা কী মনোবাসনা হ'ল শুনি,
ছিলে প্রকৃতি হ'লে পুরুষ কালী কলুষ বিনাশিনী।
যোগিনী সনে সমরে মেতে আর নাচিতে নাহি চাও,
রাখাল সঙ্গে নানা রঙ্গে নেচে নেচে মা গোঠে যাও।
হরহৃদয়ে যেতে না চাও,
রাধার আদরে হৃদে না চাও,
বাঁকা হয়ে কেন মা চাও ত্রিনয়নে গো ত্রিনয়নী।'

এইরূপ দেখিয়া কবি আত্মহারা—বিমুগ্ধ। কিন্তু তিনি যে এতদিন রক্তজবা দিয়াছেন মায়ের

রাঙাচরণে। এবার কি দিয়া মায়ের নূতন রূপকে অর্চনা করিবেন ? সতীশ তাহারও হদিশ পাইয়াছেন—

'জ্ঞানান্ধ ধ্যানান্ধ-জনের ভেদদ্বন্দ্ব মিটাইলে
বিনোদিনীকে বামে লয়ে বাঁকা হয়ে মা দেখা দিলে।
মিশায়ে লাল-জবাফুলে,
দিব তুলসী পদমূলে ;
দ্বিজ সতীশের হৃদকমলে অভেদ হয়ে রও জননী'

এখানে কী গভীর তত্ত্বটি সতীশের লেখনীসম্পর্শে বাণীরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা লক্ষণীয়। দিন বহিয়া চলে। দিনে দিনে সতীশের সংসারের অভাব বাড়ে। নানা বিপদ ঝঞ্ঝাট তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। কবি তথা ভক্তের অনুভূতিপ্রবণ মন ব্যাথায় টন্‌টন্ করিয়া ওঠে। তীব্রজ্বালায় তিনি হাহাকার করিয়া ওঠেন :—

'হ'ল একি বিষমদায় বিপদ পায় পায়, এমন ঘরে যায় কেমনে বাস করা।
এর হাঙ্কা নিষ্ঠা সাঙা, মূল খুঁটি মন ভাঙ্গা করে ঘর ভেঙ্গে ডাঙা হবে ভবদারা।
কাল ঝড়ে মা ঝড়ে পড়ছে আয়ুগুলা,
করছে ঘরে কেবল পাঁচটা ভূতে খেলা,
ঘুরছে ছ'টা চোর ন'টা দুয়ার খোলা
দিবানিশি জ্বালায় জ্বলে হলাম সারা।
প্রবেশ হয় না ঘরে জ্ঞানসূর্য বাতি
অবিদ্যা আঁধারে পোহায় না মা রাতি
জ্বালতে দেয় না ঘরে আনন্দের বাতি
কুপ্রবৃত্তি অতি মূর্তি ভয়ঙ্করা।'

বিশ্বমাতার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন :—

'কেঁদে সতীশ বলে পড়ে কর্মফেরে,
আর যেন এনো না এমন দুখের ঘরে,
লও মা কোলে করে চরণ তলে পড়ে
বাঁচি আলিস্ ছেড়ে জন্মের মত তারা।,

একদিন চন্দ্রচূড় মন্দিরে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন সতীশ। তাহার চিন্তায় ছেদ পড়িল, তাঁহার অনুজ তারেশচন্দ্রের ভর্ৎসনায়। অভাব অভিযোগে তিনি দিন রাত জর্জিতেছেন। আর এই নিষ্কর্মা শিবতুল্য অগ্রজটি খাওয়া দাওয়া আর চন্দ্রচূড় মন্দিরে বসিয়া নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতেছেন। সেই কারণেই সতীশকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন তারেশ—'দাদা, একটা কাঠচেলা করলেও তো সংসারের খানিকটা সুরাহা হয়।' সতীশ বাস্তবের কঠিন প্রান্তরে আছড়াইয়া পড়িলেন। তিনি বাড়ী ফিরিয়া সত্যই কুড়াল লইয়া কাঠচেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনভ্যস্ত হাত—ঘামিয়া উঠিলেন সতীশ। তারেশ আসিয়া অগ্রজের হাত হইতে কুড়ালটি লইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। মুক্তি পাইয়া সতীশ ফিরিলেন চন্দ্রচূড় মন্দিরে। তাঁহার নিরুপায় আহতমন গাহিয়া উঠিল :—

(আমি) ঐজালাতে জ্বলে মলাম হয়ে গেলাম খেপার পারা,
আনন্দে বসি দিবা নিশি বলতে পাই না তারা, তারা।
ভাইবন্ধু জ্ঞাতি গোষ্ঠী মিত্র আদি আপন যারা,
কেউ হল না আপনগত আপন মনে চলছে তারা।

কিন্তু সতীশ নিরুপায়। সংসার তাঁহাকে রেহাইদিবে না। কি করিবেন তিনি ?

'সতীশ বলে নিদানকালে করোনা মা চরণছাড়া
আমার শেষ বিদায়ের দায়ের মালা রইল মা মোর 'দায়ের' করা।'

মায়ের ছেলে সতীশ বিশ্বমাতার আদালতে তাঁহার শেষ দায়ের মামলা 'দায়ের' করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কি গভীর বিশ্বাস!

সতীশ তাঁহার গর্ভধারিণীরও মহাভক্ত। মাতৃবিয়োগের পর প্রচণ্ড শোকাঘাতে আহত কবি গভীর দুঃখে গাহিলেন— 'মা বিনে আর কাকে ডাকব যা'কে তা'কে
তাই আজি ডাকে অবোধ সন্তান।

মাতৃহীন শিশু কান্তিহীন দেহ,
কি দুঃখে দিন যায় মা নাহিক সন্দেহ ;
ক্ষুধার সময় হলে শুধায় না মা কেহ
মাতৃহীন গেহ অরণ্য সমান।
বেলা অবসান ভাঙবো ভাঙবো খেলা,
করুণা অঞ্চলে মুছে দে পাপ ধুলা ;
পারে যেতে হবে দাও মা পদভেলা
দ্বিজ সতীশের বেলা হ'ল অবসান।'

ভক্ত কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা বিশ্বমাতায় উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার মানবীমাতা ও দুর্গতি নাশিনী জগৎ মাতায় মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। সতীশ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে। পরিসর অল্প তাই পূর্ণচ্ছেদ টানিতে হইতেছে। তাঁহার পদ মাত্র ১২৬ খানি সংগৃহীত। কিন্তু তাঁহার একখানি পদের একটি ছত্রে পাইতেছি—'মোর রচিত পদ সাড়ে চারিশত।' বাকি পদগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। সেগুলি হয় লুপ্ত, নয় গুপ্ত নতুবা কীট ভক্ষিত। চিরদিনই প্রচার বিমুখ এই কবি। তিনি নিজের নাম প্রচার না করিয়া শুধু নিভৃতে বসিয়া 'তারা, তারা, তারা বলে—নয়ন তারা দেছা করে' মাঠান জমিকে 'কাঁদা' করিয়া গিয়াছেন—আর ফুটাইয়া গিয়াছে অথল প্রেমের অজস্র টগর গাঁদা। একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তাঁহার মধুস্রাবীপদ যে একবার শুনিয়াছে তাহার হৃদয়ে সতীশের একটি আসন চিরদিনের মত নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পদগুলিতে 'চোখ ধাঁধানো বিজলী বাতির উজ্জ্বলতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যাকালীন তুলসীতলার মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধতা এবং শুচিতা তাঁহার পদগুলির সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাংলার গন্ধবণিকগণ বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। এই পূজা কোথাও ঘটে, কোথাও প্রতিমা নির্মাণ করিয়া করা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে খ্যাত এবং ঐদিন বহুস্থানে ধর্মরাজ পূজার অনুষ্ঠান হয়। এই সব দেখিয়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা—দেবী গন্ধেশ্বরী আগে বৌদ্ধদেবী রূপে পূজিতা হতেন এবং বাংলার গন্ধবণিকগণের বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যোগ ছিল। বাংলার বহু জাতিই বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কাজেই এই ধর্মের বহু আচার অনুষ্ঠান বাংলার হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের ইহাই ধারণা। বাংলার বণিকগণ চিরকালই সমৃদ্ধিশালী এবং সমাজে তাঁহাদের প্রতিপত্তিও প্রচুর। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ লীলায় গন্ধবণিকগণের উপর প্রচুর কৃপা বর্ষণ করেন, চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ডে এই সম্পর্কে উল্লিখিত আছে—

'গোয়ালা কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥
সম্ভ্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বোলে 'আরে ভাই। ভাল গন্ধ আন।'
দিব্য গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ।
'কি মূল্য লইবা ?' বোলে শ্রীশচীনন্দন।
বণিক বোলয়ে তুমি জান মহাশয়।
তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয় ?
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর।
দুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ চিত্তে যে তোমার পড়ে।
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক, না জানি কোন রঙ্গে।

গন্ধবণিকগণের কিসের ব্যবসা ছিল উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায়।

গন্ধেশ্বরী দেবী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। এই সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার অবকাশ আছে। কথিত আছে বণিক-জাতির গন্ধাসুর নামে এক মহাশত্রু ছিল। সে বণিক জাতির নানা রূপ অনিষ্ট সাধন করিত। বণিক জাতির কুলদেবী গন্ধেশ্বরী এই অসুরকে বধ করিয়া গন্ধেশ্বরী দেবী নামে খ্যাতা হন। দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রই তাঁর পূজায় ব্যবহৃত হয়।

ইনি চতুর্ভুজা ও সিংহোপরি স্থাপিতা। দেবী দুর্গা রূপেই তাঁর পূজা হয়, এই পূজার উদ্দেশ্য বাণিজ্যের বৃদ্ধি।

দেবীর পূজায় ছাগ বলির প্রচলন ছিল। এক্ষণে ছাগ বলি আর প্রচলন নাই। পূজার দিনটি গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের উৎসবের দিন। পূর্বে বাংলার বহু স্থানে দেবীর পূজা খুবই সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইত। গন্ধবণিকগণ অনেকেই শাক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর এই সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই সম্প্রদায়ে বহু ভক্তের জন্ম হয়।

রহস্যের কবি এডগার এ্যালান পো

অভিনেত্রীর পুত্র এডগার এ্যালান পো ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী মার্কিন দুনিয়ার প্রখ্যাত অঞ্চল বস্টনে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুবয়সেই পিতাকে হারান এবং তাঁর প্রতিভাময়ী জননীও ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে অচিরেই প্রাণত্যাগ করেন। এডগারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে এগিয়ে আসেন মিসেস এ্যালান বলে এক ভদ্র মহিলা। পরবর্তীকালে তিনি ও তাঁর স্বামী মিষ্টার এ্যালান এডগারকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের সঙ্গে এ্যালান কথাটা জুড়ে দেন। এডগার হয়ে যান এডগার এ্যালান পো।

মিষ্টার এ্যালান চেয়েছিলেন এই মা-বাবা-হারা শিশুটিকে সুশৃঙ্খল করে তুলতে, কিন্তু ক্রমশ তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। যদিও দুষ্টুমিতে শিরোমণি ছিলেন এডগার, তথাপি আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকার ছিল তাঁর। অতিথিদের শিশু এডগার গান গেয়ে কবিতা আবৃত্তি করে আপ্যায়িত করতেন। তাঁদের বাড়ীর পিছন দিককার প্রতিবেশী নিগ্রোরাও সন্ধ্যাবেলা আসর জমানোর জন্য এডগারকে তাদের কাছে নিয়ে যেতেন। সেখানে এডগার নানারকম দৈত্যদানো, ভূতপ্রেত ও শ্মশানের গল্প শুনতে পেতেন এবং তখন প্রায়ই তিনি সেইসব ঘটনার পরিবেশ ও পাত্র পাত্রীদের তাঁর নৈশস্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেতেন। এ ভাবেই তাঁর মন শিশুকাল থেকে রহস্যের রূপলোকে আনাগোনা করে ফিরতো। কিছু কিছু রহস্যময় কাহিনী ও ঘটনা তাঁর মনকে এমনই আচ্ছন্ন করেছিল যে পরবর্তীকালে তাঁর অনেক লেখার এবং কবিতার তা' উপজীব্য হতে পেরেছিল।

তারপর তাঁর স্কুলজীবনে তিনি বিশেষ অধ্যয়নের দ্বারা গ্রুপদীসাহিত্য কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর একজন স্কুলের শিক্ষক বলেছেন, তিনি 'showed a strange taste for classic poetry.' 'বলাবহুল্য এই সময় তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন কবিতা পড়তে ভালবাসতেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর মনের মতন সব কবিতা রচনা করতেন। তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন এবনিজর বার্সি, রব স্কুল্লি এবং রব ষ্টানার্ড। রবের মা বালক এডগারকে খুব ভাল বাসতেন, স্নেহ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্যেই এডগার তাঁর প্রখ্যাত কবিতা To Helen রচনা করেন।

নানান জীবিকা—মূলতঃ পত্রিকা সম্পাদনার কাছে ব্যাপৃত থাকলেও এই প্রতিভাধর কবির কাছে লেখাই ছিল অন্যতম আকর্ষণ। জীবনের সব অবস্থার মধ্যেই তিনি তাঁর ক্লান্তিহীন লেখনী চালনা করে গেছেন। যদিও তাঁর আপনদেশে দীর্ঘদিন তিনি অবহেলিত ছিলেন। সেখানে তাঁকে লোকে বলতো, 'ছড়াকাটা লোকটা' (এমারসনের ভাষায়) তবু তাঁর প্রতিভার নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি ছিল ইংরেজ কবি টেনিসনের কাছে, আইরিস কবি ডবলু. বি, ইয়েটসের কাছে এবং সর্বোপরি বোদলেয়র থেকে ভ্যালেরী পর্যন্ত সকল ফরাসী কবি লেখকদের কাছে। সীওয়েল বলেছেন, 'পো-র

পাঁচভাগের তিন ভাগ প্রতিভা…।'

পোর কবিতার ছন্দ বিন্যাস ও রূপকল্পকে, প্রায় প্রত্যেকেই অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করেছেন। ইউলালি এই ছন্দকৌশলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনমূলক কবিতা। নীচের এই পংক্তিগুলি মালার্মের মতন কবিও তাই উচ্চ প্রশংসা করেছেন—

ছিলাম আপন মনে,
রোদনভরা সে জগৎ,
স্রোতহীন ছিল গান,
তারপর একদিন
লজ্জানম্রা সুন্দরী মনোহরা
ইউলালী এল প্রাণে
সোনালী চুলের
হাসিমাখা ইউলালী
কণ্ঠে আমার পরল বরণমালা।

এই কাব্যাংশে লক্ষ্যণীয় পো-র রোমান্টিক মানসিকতা। পো যেন বাস্তব সংসার থেকে সুন্দর রঙের কল্পনার রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। এই রাজ্যে রহস্যের পর রহস্যের রূপলোক। দিগন্তের পর দিগন্ত। মন এখানে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতন বাঁধাহীন গতিছে উড়ে চলে।

লেনোর কবিতায় এই পংক্তিগুলিও কী আশ্চর্য সুরেলা!

স্বর্ণপাত্র ভেঙে হল চূড়মার
উড়ে চলে গেছে মন
শেষ বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে বাজুক,
বৈতরণীতে ভাসছে আত্মা
দিব্য সে রমণীয়।
হে কঠোর
তোমার চোখে কি নেই জল?
নয়নের বারি ফেল এইবার
আর কবে অবসর?
চেয়ে দেখ ঐ কঠিন সে শবাধারে
চিরনিদ্রায় রয়েছে শায়িত
লেনোর পরাণপ্রিয়া।

এই স্তবকের মধ্যে রয়েছে রহস্য-রোমাঞ্চ ও ভবিষ্যৎ কাব্যবস্তুর আভাস। এইরকম রহস্যাভাস আছে আরও অনেক কবিতাতেই। যেমন— দূরে বহুদূরে ম্লান পশ্চিম দিগন্তে,
যেথা আছে, ভালো মন্দ, নিকৃষ্ট আর উৎকৃষ্টের দল
চিরশান্তির সুমহান পারাবারে—

দেখা যাচ্ছে কবি পো কখনই কিছু একটানা, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্পষ্টভাবে বলে ফেলেন না। তাঁর সব কিছুই অভাসে ইঙ্গিতে, রহস্য সৃষ্টি করে।

অ্যানীর জন্য, সমুদ্রনগর, দি বেলস, দি রাভেন এবং অসংখ্য ক্ষুদ্রতর কবিতার মধ্যে অবিস্মরণীয় অলৌকিক আভা বিচ্ছুরিত হয়েছে। 'সনেট : বিজ্ঞানের প্রতি' নামক কবিতায় তিনি কুহকমায়ার তিরোধান সম্পর্কে দুঃখ করে বলেছেন—

নাইডাককে নিয়েছ প্লাবন থেকে।
সবুজ ঘাসের আর
আমার বুক থেকে এলফিনকে
নিয়েছ
আর কাড়োনি কি তুমি
তেঁতুল তলার থেকে
গ্রীষ্ম দিনের স্বপ্ন?

একাকি ও স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন—দীর্ঘক কবিতা দুটিও অতি চমৎকার। এখানেও এডগার এ্যালেন পোর অপার রহস্যানুভূতি লক্ষ্য করবার মতন। এখানেও কবি এনেছেন কল্পনার স্বপ্ন ধূসরতা, প্রসাদগুণসিদ্ধ কাব্যচিত্র। সবমিলিয়ে সৃষ্টি করেছেন উজ্জ্বল একটি কল্পনার অলকা।

এডগার এ্যালান পোর কবিতার চেয়ে তাঁর রচিত গল্পগুলোই অধিক রহস্যাবৃত। তাদের আলোচনা অন্য সময় হতে পারে। তাঁর কবিতারও এটি যথেষ্ট অলোচনা নয়। এটি কেবলমাত্র তাঁর সামান্য কবি পরিচিতি। তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লরা বেনেট বলেছেন, 'তাঁর কবিতাতে অন্তরনিহিত আছে এক এমন সঙ্গীত যা ঘণ্টা-ধ্বনির মতন।' তাছাড়াও পো অন্য কবিতা লিখেছেন যা' আঙ্গিকের এবং শব্দের সৌন্দর্যে অন্যতম কবিতারূপে বিদ্যমান। রূপকল্পের মাধুর্যে তাঁর এই সব কবিতা রোমান্টিক রীতি ও মেজাজকে তুলে ধরে। বলা যেতে পারে এডগার এ্যালেন পো তাঁর কবিতায় এমনই এক রহস্য ও রূপলোকের দুয়ার খুলে দিয়েছেন যেখান দিয়ে কখন এসে পড়েছে সুদূর স্বর্গের আলো। এবং সেই আলোতে পাঠক পাঠিকার মন প্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

নির্দেশপঞ্জী

(1) Famous American poets by Lawra, Bent, Dold, Mead and Company, Newyork 1964.

(2)। The literature of the United State—Marens Cunliff.

সমালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল। প্রমথনাথ বিশী। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। পৃ: ১৪৭। ১৭'০০

বঙ্কিম উপন্যাসের উপাদান বিচার। ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। পৃ: ২০৫। ১৫'০০।

বঙ্কিম অভিধান (২য় খণ্ড)। ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। পৃ: ২০৭। ১৫'০০।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে যে আজও একটি সজীব ব্যক্তিস্বরূপে বিরাজমান তার প্রমাণ এখনো তাঁকে নিয়ে নিত্যনূতন গবেষণা ও রসগ্রাহী সমালোচনা পুস্তক প্রকাশের দ্বারা সমর্থিত। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি, নানা অনুষ্ঠান ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে জাতীয়মন্ত্রের উদ্গাতার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে গত দু' বছর ধরে। সেদিক থেকে 'পুস্তক-বিপণি'র বঙ্কিম বিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ এই উপলক্ষে প্রকাশক কর্তৃক শ্রদ্ধানিবেদনের সার্থক প্রয়াস বলে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

প্রমথনাথ বিশী সমালোচনা-সাহিত্যে একটি নূতন ধারার প্রবক্তা। রসগ্রাহী সমালোচনা বলতে যা বোঝায় প্র-না-বি-র গ্রন্থে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে। পাণ্ডিত্য যে শুষ্ক-নীরস তথ্যমাত্র নয়, রসগ্রাহী অনুভব, তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর প্রতিটি সমালোচনা গ্রন্থে। বলাবাহুল্য বর্তমান গ্রন্থও তার ব্যতিক্রম নয়।

'বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল' গ্রন্থটি পনেরটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ—বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণ, নব্য বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত, বাংলা রসসাহিত্য, সাহিত্যে অশ্লীলতা, সাহিত্য আকাদমীর আদর্শ ও প্রচার, সংস্কৃত বর্জন না সংরক্ষণ, সাহিত্য বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা, যান-যন্ত্র ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বেতার. বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী বইয়ের বাজার : সমালোচক, রামায়ণ ও মহাভারত, নবস্বাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, বড়দিদি। প্রবন্ধগুলি বিষয়বৈচিত্র্যেই প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম দুটি প্রবন্ধ দীর্ঘ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার এই দুই দিকপাল সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, তেমনি আবার বঙ্কিমচন্দ্রও এই নবীন কবিকে স্বাগত জানিয়েছেন। আবার উভয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য বা বাদানুবাদ যে হয়নি এমন নয়। এসব তথ্য ইতিহাসের অন্তর্গত।

কিন্তু সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তথ্যসাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমন্দ্রের কাছে কি পরিমাণ ঋণী তা দেখাবার চেষ্টা ইতিপূর্বে হয়নি। নব্য বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত আর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলাসাহিত্যের রোমান্টিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল তার প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং চিন্তায় নূতনত্বে সমুজ্জ্বল। গ্রন্থটি আদৃত হবে আশা করি।

ডঃ অশোককুমার কুণ্ডুর 'বঙ্কিম উপন্যাসের উপাদান বিচার' গ্রন্থটিতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিম-উপন্যাসের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে—বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন উপন্যাসে তার প্রভাব, ছাত্রজীবনের পাঠ্যগ্রন্থ ও তার প্রভাব, বঙ্কিম উপন্যাসে সমসাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার প্রভাব, পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের প্রভাব. পাশ্চাত্য-সাহিত্যের প্রভাব, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, বঙ্কিম উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার স্বরূপ নির্ণয়, বঙ্কিম উপন্যাসে পাঠান্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিম-মানসের ক্রমবিকাশ, বঙ্কিম উপন্যাসে আঙ্গিকের মূল্যায়ন ও তাতে তাঁর জীবনবোধের বিশিষ্টতার প্রতিফলন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চোদ্দটি উপন্যাস বাঙালীকে দীর্ঘ একশো বছর ধরে যে আনন্দ উপভোগের সুযোগ দিয়েছে তা আজও জীর্ণ হয়নি। এগুলির মধ্যে রসসৃষ্টির যে ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে তা প্রামাণ্য সত্য। কিন্তু সাহিত্যিক যেহেতু সামাজিক মানুষ, সেহেতু সমাজ ও জীবনের উপাদান নিয়েই তিনি রসের সোপান গড়ে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে উপাদানের খুবই অভাব। কিন্তু তার মধ্য থেকেই যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তারই আলোকে বর্তমান গ্রন্থের লেখক নূতন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলির প্রতিটি সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তনগুলি তাঁর মানসিকতারই যে ক্রমবিবর্তন এ তথ্য প্রমাণসহযোগে লেখক প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাল্যকালে যে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য লিখতেন এই ভাবে—গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পসংকাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহ বিষয়বিষার্ণবে রহিয়াছে।' তিনিই পরিণত বয়সে লিখলেন—'এই তো বৈতরণী! পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়। আমার জুড়াইবে কি?' মনের পরিণতির সংগে সংগে বঙ্কিমের রচনারীতিরও কি ভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা দেখিয়েছেন লেখক।

গ্রন্থটির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এর সুখপাঠ্যতা ও চিন্তাধারার স্বচ্ছতা।

ডঃ অশোককুমার কুণ্ডুর 'বঙ্কিম অভিধান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য রচনার আলোচনা করা হয়েছে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত করে। লেখক জানিয়েছেম 'বঙ্কিম-অভিধান'-এর প্রথম খণ্ডে তিনি বঙ্কিম উপন্যাসের যাবতীয় চরিত্র, গ্রন্থনাম, পরিচ্ছেদ ও উপন্যাসে উল্লিখিত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও জীবনসংক্রান্ত তথ্যও আছে।

এই জাতীয় গ্রন্থের সুবিধা এই যে হাতের কাছে সব তথ্যগুলি সাজানো থাকে বলে যখনি প্রয়োজন হয়, তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষতঃ যে সমস্ত পাঠক গুরু ধরে শিক্ষালাভ

করতে চান না, তাঁদের হাতের কাছে এরকম একখানি বই থাকলে অসুবিধা হয় না। বাংলাসাহিত্যে এরকম সাহিত্য অভিধান জাতীয় গ্রন্থ খুব বেশি নেই। এই জাতীয় গ্রন্থ জনপ্রিয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু 'লেখকের নিবেদন' অনুসারে এই গ্রন্থের ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মধ্যে দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধানের কারণ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ বিষয়ে অবিলম্বে সরকারী পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

'আর্যাভিহরণ' (কৃষ্ণচরিত্র ৪।৯) থেকে 'হেমন্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপোকথন' (বাল্যরচনা—পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণানুক্রমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ রচনার বিচিত্র পরিচয় যে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা নয়, সেই রচনাগুলির প্রকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, সংস্করণ সম্বন্ধীয় আলোচনা ও সর্বোপরি রসগ্রাহী আলোচনা করা হয়েছে। একটি পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের এই সব রচনা থেকে 'সুভাষিত' ও সঙ্কলিত হয়েছে। এই সব রচনায় বঙ্কিম যে সমস্ত তথ্য ব্যবহার করেছেন সেগুলি লেখক তৃতীয় খণ্ডে সরবরাহ করবেন বলে জানিয়েছেন। আমরা আশ করব তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে যেন আরো আট বছর দেরী না হয়।

বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিম সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

প্রণবকান্তি সিংহ

বাংলা সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে। ১৯৭৮ সালের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

১। **পূর্ব-বাংলার গল্প** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় সেই সূত্রে রচিত কয়েকটি গল্পের সংকলন। মূল্য ৭.০০ টাকা।

২। **রূপান্তর** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত তথা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী মূলসহ এই গ্রন্থে সমাহৃত। মূল্য ৭.০০ টাকা।

৩। **সন্ধ্যাসংগীত** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠভেদ সংবলিত সংস্করণ

সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতার দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিচিত্রাদিতে সমৃদ্ধ। মূল্য ৭.০০ টাকা।

৪। **ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠভেদ সংবলিত সংস্করণ

১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিনাস্বাক্ষরের ব্যঙ্গরচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' এই সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৬.০০ টাকা।

৫। **লক্ষ্মীর পরীক্ষা** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সচিত্র সংস্করণ। শ্রীবিজন চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলী সংবলিত ছোটদের অভিনয়োপযোগী রবীন্দ্রনাট্যকাব্য, স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে। মূল্য ৪.০০ টাকা।

৬। **কুরুপাণ্ডব** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত

বাংলা রচনারীতিতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্যতা উভয়েরই পরিচয়ের জন্য এ গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী। মূল্য ৩.০০ টাকা

৭। **রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী** ॥ শ্রীপুলিনবিহারী সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' থেকে 'রাজা ও রানী' পর্যন্ত পঁচিশখানি গ্রন্থের প্রকাশ, বিভিন্ন সংস্করণে বিবর্তন ও পাঠভেদ, সমসাময়িক সাহিত্যসমাজে প্রতিক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ এই খণ্ডে সংকলিত। আলোচিত প্রত্যেক গ্রন্থের আখ্যাপত্রের বিশদ বিবরণ এবংকয়েকখানি গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র-সংবলিত। মূল্য ১৪'০০ টাকা।

কমিশনের হার : সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০'০০ টাকা, পুস্তকবিক্রেতা শতকরা ৩০.০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
১০ প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭১
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী